নারদ বাসুদেব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মুক্তির উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন :

"সকল কর্ম্মই ভগবানে সমর্পণ করিবে। মনকে নিরোধ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করিলেই অভয় লাভ হয়।"

মায়ার স্বরূপও বলিয়াছিলেন :—

"সর্ব্বভূতাত্মা আদিপুরুষ যে শক্তি দ্বারা ভূতসমূহ সৃষ্টি করেন, সেই শক্তিই তাঁহার মায়া। তিনি স্বয়ং এই ভূতসমূহে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার অংশভূত জীবাত্মাকে একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়সমূহ ভোগ করাইতেছেন। জীব বিষয়ে আসক্ত হইয়া সংসারক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত কেবল নানা জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।"

মহাপ্রলয়ে, মহাকাল ব্যক্তকে অব্যক্তে লইয়া যাইতে আকর্ষণ করে। তখন শতবর্ষ অনাবৃষ্টিজনিত বিশ্ব দগ্ধ হয় এবং তৎপরে শতবর্ষকাল অবিরাম বৃষ্টিজনিত প্লাবনে এই বিশ্ব বিলীন হইয়া যায়।

"জ্যোতির রূপ অন্ধকার দ্বারা হৃত হইয়া বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ তামস অহংকারে, ইন্দ্রিয় সকল সাত্ত্বিক অহংকারে এবং অহংকার মহতত্ত্বে লীন হয়। ইহাই মায়ার স্বরূপ।"

দশম স্কন্ধের নবতিতম অধ্যায়ে সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করা আছে। শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও চিন্তা দ্বারা মনুষ্য তাঁহার সালোক্য লাভ করে এবং দুরন্ত কৃতান্তকেও জয় করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।

একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ আমি দিলাম না, কারণ, উহার প্রতিটি অধ্যায়ই সকলের পড়া উচিত। সংক্ষেপে দিলে কোনও উপকার হইবে না। এই কয়টি অধ্যায়ে বহু কিছু জিনিষ জানিবার আছে,



যথা, অষ্টগুরুর বিষয় বর্ণনা, অবধূত, বহুগুরুর নিকট কি কি শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা, বদ্ধ-মুক্তির লক্ষণ, সাধুসঙ্গ মহিমা, ধ্যানযোগ বর্ণনা, মহাবিভূতি কথন, পরামার্থ নির্ণয় ইত্যাদি অনেক বিষয়েই এই কয়টি অধ্যায়ে আছে। একা অবধূতের ২৪ গুরুর কথা পড়িলেই মানুষের বহু বিষয়ে শিক্ষা হয়।

—●—

শ্রীমদ্ভাগবত সংক্ষেপে লিখিলাম, সেজন্য কয়েকবারই পড়িবার সুযোগ হইল, খুব শান্তি পাইলাম। আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার লইয়া, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল লইয়া, সূক্ষ্মদেহ লইয়া ঐ সকলের উপযুক্ত দেহ পাইয়াছি। আমি বলিতে 'আমি' রূপী জীবাত্মা।

সংস্কার পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আমার আছে, বিবেক বুদ্ধির সাহায্যে। কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। আমার সুখ-দুঃখ এখন আর আমার নিজের হাতে নাই, কারণ তাহা আমার পূর্ব্ব কর্ম্মফলজনিত। শ্রীহরির কৃপায় সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান করিতে পারি। হাসিবও না, কাঁদিবও না। দেহ থাকিতে কর্ম্ম করিতেই হইবে, এই ভাবিয়া কর্ম্ম করিব। যদি আনন্দ করিতে হয়, শ্রীহরিকে লইয়া আনন্দ করিব। পুত্র, কন্যা, স্ত্রী সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিবেই। পূর্ব্বজন্মে তাহাদের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ ছিল না, পরজন্মেও থাকিবে না। কাজেই তাহাদের সুখ-দুঃখ লইয়া আমার মাথা ব্যথার কোনও প্রশ্নই আসে না। আমাদের কর্ত্তব্য সন্তানদের সাধ্যমত ভালভাবে লালন পালন করা,

তাহাদিগকে সৎ উপদেশ দেওয়া যাহাতে তাহাদের স্বভাব শুদ্ধ হয় এবং শ্রীহরিতে ভক্তি হয়।

—*—

সংক্ষেপে বেদ, বেদান্ত, ব্রহ্মসূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত লিখিলাম। এখন সংক্ষেপে শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্য কীর্তন করিব। আজীবন সেই ব্রহ্মময়ী মায়ের শ্রীচরণে পড়িয়া সংসারের সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছি।

## শ্রীশ্রীচণ্ডী মাহাত্ম্য

শ্রীশ্রীচণ্ডী কে?

তিনি বেদের ব্রহ্ম, পুরাণের মহামায়া, জ্ঞানীর ব্রহ্ম, তিনি ব্রহ্মময়ী, তিনি অব্যক্তাবস্থায় তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্ম, আবার ব্যক্ত অবস্থায় ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, তিনি জীবদেহে ব্যষ্টিরূপে আত্মা, সমষ্টিরূপে বিশ্বাত্মা, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্। তিনি সমকালে নির্গুণ, সগুণ, অবতার ও আত্মা। তিনি নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধি ব্রহ্ম। সচল অবস্থায় সবিকার, সবিশেষ, সৃষ্টি-স্থিতিভঙ্গকারিণী ব্রহ্মশক্তি। তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার সাক্ষী। তিনি অঘটন-ঘটন পটীয়সী। তিনি সর্ব্বপ্রবৃত্তিময়ী, সর্ব্বইন্দ্রিয়-স্বরূপিনী, আবার চিৎবস্তু আত্মারূপে সংস্থিতা। তিনি অনন্ত নাম রূপ ধারণ করিয়া জড় ও চিৎস্বরূপে প্রকাশিতা। তিনি ভক্তের ভগবান, যোগীর পরম ব্রহ্ম সনাতন, ভোগ ও মোক্ষ প্রদায়িনী। তিনি অবিদ্যারূপে জীবকে বিষয়াসক্তিতে বন্ধন করেন, আবার বিদ্যারূপে বন্ধন মোচন করেন। তিনিই লীলাময়ী, সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা এবং শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ-পরায়ণা। তিনি সৎ ও অসৎ, নিত্য ও অনিত্য হইয়াও দুর্জ্ঞেয়



তত্ত্ব। তিনি যোগমায়া, তিনিই দুর্গা, তিনিই কালী, তিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ। তিনি অনন্ত বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তাঁহার ইচ্ছায় পঙ্গু পর্ব্বত পার হইতে পারে। মানুষ, ব্রহ্মা, ঋষি ও সুবিদ্বান্ হইতে পারে। তিনিই মুক্তিদায়িনী "মা"।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ লেখার সময়, দেবী মাহাত্ম্য কিভাবে প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা লিখিয়াছি। এখানে তাহা আবার লিখিতেছি:—দেবীমাহাত্ম্য মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। দেবী মাহাত্ম্য মেধস মুনি, রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথোপকথন 'শ্রীশ্রীচণ্ডীতে' লিপিবদ্ধ আছে। মার্কণ্ডেয় মুনি ঐ কথোপকথন শ্রীব্রহ্মার নিকট শুনিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনি তাহা বিপ্র ভাগুরীকে শুনাইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনি বিপ্র ভাগুরীকে যাহা শুনাইয়াছিলেন, তাহা হুবহু দ্রোণপুত্র সর্ব্বজ্ঞ পক্ষিগণ মহর্ষি জৈমিনিকে বলিয়াছিলেন। পক্ষিগণ মহর্ষি জৈমিনিকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই "শ্রীশ্রীচণ্ডী" রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যাস-শিষ্য সূত কর্ত্তৃক নৈমিষারণ্যে ঋষি সমাজে ইহা কথিত হয়। ইহা বিধিমত পাঠ করিতে হয়।

সাবর্ণি নামে সূর্য্যবংশের এক রাজা ছিলেন। ইহা দ্বিতীয় মন্বন্তরের কথা যখন মনু ছিলেন স্বরোচিষ। যবনেরা সেই রাজার রাজত্ব জয় করিয়া লয়। তিনি মৃগয়ার ছলে বনে প্রবেশ করিলেন এবং মেধষ-মুনির আশ্রমে আশ্রয় লইলেন। সেখানে থাকাকালে রাজা সতত নিজের বিষয় সম্পত্তির কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সমাধি নামে এক বৈশ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? তোমায় দুঃখিত দেখিতেছি?"

বৈশ্য কহিল, সে একজন ধনী। তাহার দুষ্ট স্ত্রী-পুত্রেরা তাহার ধনরত্ন হরণ করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছে। কাজেই আত্মবন্ধুরাও তাহাকে ছাড়িয়াছে। সে দুঃখে বনে প্রবেশ করিয়াছে এবং এখানে আসিয়া সেই দারাপুত্র ও বন্ধুদের কথাই চিন্তা করিতেছে, গৃহে মঙ্গল কি-না, স্ত্রী-পুত্র সৎ কি অসৎ বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে ইত্যাদি।

রাজা বলিলেন, "তোমায় যাহারা ধন-সম্পদ হরণ করিয়া দিয়াছে, তাহাদের প্রতি তোমার কিজন্য মমতা হইতেছে?" বৈশ্য বলিল, "সবই সত্য, কিন্তু মন মমতাহীন হইতেছে না। সেই স্নেহ ভালবাসা ভুলিতে পারি না। তাহারা ভালবাসে না এবং স্নেহহীন। কিন্তু আমি দারাপুত্রের প্রতি কি করিয়া নিষ্ঠুর হইব? কে এই মায়ার বন্ধন দিয়াছে?"

তখন রাজা সুরথ বৈশ্যকে সঙ্গে লইয়া মেধস মুনির কাছে গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন এবং জানিতে চাহিলেন, কিজন্য আমরা দুঃখ পাই? কেনই বা আমাদের এই মোহ? জ্ঞানী হইয়াও আমরা কিজন্য এরূপ মুগ্ধ হই?

মেধস মুনি বলিলেন,—

"ইন্দ্রিয় বিষয়ে যে জ্ঞান তাহা সাধারণ জ্ঞান। পশু-পক্ষীদেরও সে জ্ঞান আছে। মোক্ষ প্রকাশক যে জ্ঞান তাহাই 'জ্ঞান'; চৈতন্য-সমাধিগত সমস্তই ব্রহ্ম যে জ্ঞান তাহাই প্রকৃত জ্ঞান।

মায়া মোহে যে জ্ঞান তাহা পশু, পক্ষী ও মনুষ্যে একই প্রকার। ক্ষুধাতুর পাখীও নিজ শাবকের মুখে শস্য দিয়া সুখী হয়। প্রত্যুপকারের মোহে মানুষ সন্তানের প্রতি অভিলাষী। মমতা-



বশতঃ 'আমার' 'আমার' বলিয়া জীব সর্ব্বদাই, সংসারের স্থিতি-কারিণী মহামায়ার বশে অবশে মোহ-গর্ত্তে মায়াবর্ত্তে পড়িতেছে।

তিনিই জ্ঞানদৃষ্টিকে মায়া-মেঘে ঢাকিয়া অন্ধকার করিয়া থাকেন। তিনিই এই বিশ্বকে মায়াতে মোহিত করেন। তোমরা মোহিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সেই দেবী বলে আকর্ষণ করিয়া জ্ঞানিদেরও চিত্ত বিমোহিত করেন। তিনিই এই বিশ্বচরাচর সৃজন করিয়াছেন। তিনি প্রসন্ন হইলে মুক্তি বরদান করেন।

তিনি নিত্যা, বিদ্যা, মুক্তিমূলা এবং সকল বন্ধনের হেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশেরও তরিবার সেতু।"

রাজা বলিলেন, "কেবা সেই দেবী, কিবা জন্ম কর্ম্ম তাঁর, তাঁর নাম কি, স্বভাব, জন্ম ইত্যাদি সবই আমাদিগকে বলুন।"

মেধস মুনি বলিলেন,— "তিনি নিত্যা। জগন্মূর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন, তথাপি তাঁর জন্ম অনেক প্রকার। যখনই তিনি দেবকার্যের জন্য আবির্ভূতা হন, তখনই লোকে বলে মাতা জন্মিয়াছেন।

প্রলয়কালে যখন জগৎ জলময় কারণবারিতে মগ্ন, সর্ব্বব্রহ্মময় বিষ্ণু তাহার মধ্যে অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া সৃষ্টির স্বপ্নের ন্যায় দেখিতেছিলেন, যোগনিদ্রাবশে, ব্রহ্মজ্ঞান আবরিত হইয়া, কাম-ক্রোধ বশে সৃষ্টির বুদ্‌বুদ্ উঠিতেছিল। এমন সময় কাম-ক্রোধের মূর্ত্তি মধু ও কৈটভ নামক দুই ভীষণ অসুর বিষ্ণুর কর্ণ-মূল হইতে জন্মিয়া, বিষ্ণুর নাভিকমলস্থিত ব্রহ্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল।

ব্রহ্মা প্রজাপতি জনার্দ্দনকে নিদ্রিত দেখিয়া—তাঁহাকে জাগ্রত করিবার জন্য একমনে যোগনিদ্রার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন,

যিনি মায়াতে এই বিশ্ববৈভব বাঁধিয়াছেন, যিনি ভগবানের নেত্রে নিবাস করেন, যিনি ব্রহ্মতেজে নিরুপমা, স্থিতি—সংহারিণী।

ব্রহ্মার স্তব ;

'দেবী তুমি দেবযজ্ঞে দানমন্ত্র 'স্বাহা'। পিতৃযজ্ঞে তুমি দানমন্ত্র 'স্বধা'। হে নিত্যে, অমৃতরূপা ত্রিগুণপালিনী, অ, উ, ম ওঙ্কার তুমি ত্রিমাত্রাধারিণী।

নির্গুণেতে তুমি অর্দ্ধ 'অর্দ্ধমাত্রা' নাম, সগুণে নির্গুণে হয়ে পূর্ণানন্দ ধাম॥ অব্যক্তে অনুচ্চারিত গায়ত্রী জননী। তুমি সেই পরাৎপরা তারা ত্রিনয়নী॥

ধরেছ করেছ সব সৃজন পালন।
জগন্ময়ী অন্তে ক্রোড়ে করিছ গ্রহণ॥
সৃষ্টিকালে সৃষ্টিরূপা পালনেতে স্থিতি।
শেষে বুকে লও সুখে তাই ধ্বংস নীতি॥
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা স্মৃতি।
মহামোহ মহাদেবী মহাদৈত্য শক্তি॥
বিশ্বের প্রকৃতি তুমি ত্রিগুণা মা শ্যামা।
কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রি ভীমা॥
লজ্জা একাগ্রতা বুদ্ধি তুমি শ্রীঈশ্বরী।
পুষ্টি তুষ্টি ক্ষান্তি আর শান্তি শুভঙ্করী॥
শঙ্খ চক্র গদা শূল খড়্গ সুশোভিনী।
ধনুর্ব্বাণ ভুশুণ্ডী ও পরিঘ-ধারিণী॥
সুশ্রী, সুশ্রী হতে সুশ্রী— অতীব সুন্দরী।
শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠতরা শ্রেষ্ঠগণের ঈশ্বরী॥
সদসৎ যেথা যাহা, শক্তি তুমি তার।
কি স্তব অখিলাত্মিকে, করিব তোমার ?



জগৎ স্রষ্টা জগৎ পিতা জগদণ্ড কেরে।
নিদ্রিত করেছ, স্তব কে করিতে পারে!
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে ধরাইলে দেহ।
জননী তোমার স্তব সমর্থ কি কেহ ?
হেন প্রভাম্বিতা সেই বাক্যতীতা তুমি,
তোমার মাহাত্ম্যে তব স্তুতি করি আমি—
দুরন্ত অসুরদ্বয় দুষ্ট সুর অরি।
মধু-কৈটভেরে মাগো দেও মুগ্ধ করি॥
নাশিতে অসুরদ্বয় অচ্যুতে উঠাও,
জগদীশ জনার্দ্দনে জননী জাগাও॥

(এই স্তবটি শ্রীকুমার নাথ সুধাকরের বাঙ্গলা চণ্ডী হইতে লইয়াছি, কারণ বাঙ্গলায় এত সুন্দর ভাবে স্তবটি লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।)

মেধস মুনি বলিলেন :— ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলে পর, তম-নিদ্রা প্রদায়িনী সেই দেবী ব্রহ্মচৈতন্যকে জাগাইতে ও বিষ্ণুমল মধু-কৈটভকে বিনাশ করিতে, বিষ্ণুর নেত্র, মুখ, নাসা, হৃদয়, বাহু ও বক্ষ হইতে ব্রহ্মার সম্মুখে বাহির হইলেন। তখন নিদ্রামুক্ত শক্তিযুক্ত জনার্দ্দন কারণ-বারির উপর উঠিয়া দেখিলেন, মধু কৈটভ ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে যাইতেছে। তখন বিষ্ণু বিশ্বম্ভর তাহাদের সহিত পঞ্চ সহস্র বৎসর বাহু-যুদ্ধে রত হইলেন।

রূপামুগ্ধ জ্ঞানোন্মত্ত দুই দৈত্য তখন কেশবকে কহিলেন, 'তুমি এখন আমাদের নিকট বর লও'। শ্রীভগবান কহিলেন, 'যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে এই বর চাই যে, তোমরা আমা কর্ত্তৃক বধ্য হও ; অন্য কোনও বর চাই না'।

মুনি কহিলেন, হরি কৃপা ছলনায় তুষ্ট দৈত্যদ্বয় বিশ্ব জলময় দেখিয়া শ্রীভগবানকে কহিল, যেস্থান কখনও জলমগ্ন হয় নাই, সেই-স্থানে আমাদের নিধন কর।'

তখন শঙ্খ চক্র গদাধারী 'তথাস্তু' বলিয়া মুক্তির 'কুটস্থ চক্র' তুলিয়া মধু-কৈটভের মস্তকদ্বয় নিজ উরুপরে রাখিয়া, কাটিয়া দিলেন, এবং তাহাতে প্রবেশ করিয়া সহস্রদল কমলে দর্শন দিলেন।

মুনি বলিলেন, ব্রহ্মার সাধনে বিষ্ণুর শরীর হইতে যেইরূপে মহামায়া মায়া আকর্ষিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা তোমাদের কহিলাম, এখন তাঁহার অপূর্ব্ব প্রভাব পুনরায় শ্রবণ কর।

—*—

## মধ্যম চরিত্র

### দ্বিতীয় অধ্যায়

### মহিষাসুর সৈন্যোদ্ধার

ঋষি বলিলেন, 'পুরাকালে সুরপতি মহামতি পুরন্দর ও মহিষাসুর উভয়ে প্রভুত্ব করিয়া শতবর্ষ ধরিয়া দেবাসুর যুদ্ধ নামে সমর করিয়া-ছিলেন। মহিষাসুর সুরদিগকে জয় করিয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব হরণ করিল। দেবগণ পরাজিত হইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া হরিহর যেখানে থাকেন সেখানে গিয়া সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন, কি করিয়া মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য হইতে দেবগণকে বিতাড়িত করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া শঙ্কর ও মধুসূদন ক্রোধেতে অধীর হইলেন। তখন শিব ও বিষ্ণুর মুখ হইতে অগ্নিসম মহাতেজ নির্গত হইতে লাগিল। তাহার সহিত ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের তেজও আসিয়া মিলিত হইল এবং সকল দিক্ তাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় দৃশ্য হইল। সেই অতুল্য মিলিত তেজ হইতে এক নারী বাহির হইলেন।



শিব হইতে তাঁহার মুখ, যম হইতে কেশ, বিষ্ণু হইতে বাহু এইরূপে এক এক দেবতা হইতে এক এক অঙ্গ তৈয়ারী হইল।

এই সকল দেবতারা তাঁহাদের নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ ভূষণ ও অলঙ্কার দ্বারা দেবীকে ভূষিত করিলেন ও শ্রেষ্ঠ অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করিলেন। হিমালয় পশুরাজ সিংহকে বাহন-রূপে দিলেন। এইরূপে সজ্জিত হইয়া সেই নারী-রূপিনী দেবী অট্টহাস্য করিয়া, গভীর গর্জ্জন করিয়া মুহুর্মুহু নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই দেবী সিংহবাহিনীর ভয়ে ত্রিলোক ক্ষুব্ধ হইল। দেবারি সকল কাঁপিতে কাঁপিতে সৈন্য সুসজ্জিত করিতে লাগিল। মহিষাসুর সংখ্যাতীত বীর লইয়া দেবীকে লক্ষ করিয়া ছুটিল। সে দেখিল দেবীর অঙ্গ জ্যোতিতে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত হইয়া আছে এবং পদ-ভরে ধরা নত হইয়াছে, আর দেখিল সহস্রভুজ বিস্তার করিয়া ও দশ-দিক ব্যাপ্ত করিয়া চণ্ডিকা প্রখর তেজোময়ী হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

সেই চণ্ডিকার সহিত মহিষাসুরের প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে মহিষাসুর কখনও অসুররূপ কখনও বা মহিষরূপ ধারণ করিয়া সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বহু দৈত্য, হয়, হস্তী হত হইল এবং রক্তের নদী বহিতে লাগিল। পরিশেষে দেবী মহিষাসুরের মহিষ রূপের উপর লম্ফ দিয়া আরোহণ করিয়া পদ দ্বারা কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া মহাশূল দ্বারা তাহাকে নিধন করিলেন।

মহিষাসুর বধে ইন্দ্রাদি দেবগণ আনন্দিত হইয়া তাঁর স্তুতি করিতে লাগিলেন।

—*—

## চতুর্থ অধ্যায়
## দেবী স্তুতি

ঋষি বলিলেন, দেবতারা স্তুতি করিয়া সকলে মিলিয়া নন্দন কাননে আসিয়া ফুল-চন্দন-ধূপ-দীপসহ ভক্তিভরে ভগবতীর পূজা করিলেন এবং সেই দশভুজাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সকলে কোলাকুলি করিলেন। সেই জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণাকে সকলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। দেবী প্রসন্ন হইয়া বর দিতে চাহিলেন।

দেবতারা বলিলেন, 'আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। আমাদের আর কিছু প্রয়োজন নাই। তবে যদি কেহ তোমায় বার বার স্মরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিও।'

যদি কেহ তোমার স্তুতি পাঠ করে, তাহা হইলে তাহার মনস্কাম পূর্ণ করিও। তাহাকে চিদৈশ্চর্য্য দিও। তাহাকে দারাপুত্র ধনে বৃদ্ধি করিও ও চিরসুখী করিও।" ঋষি বলিলেন—দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

শুম্ভ-নিশুম্ভ উদ্ধারের জন্য, ত্রিলোক রক্ষার জন্য দেব-হিতৈষিণী দেবী যেরূপ আবার গৌরীদেহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা পুনরায় শ্রবণ কর।

(সব পুরাণে মহিষাসুর বধের কাহিনী একপ্রকার নহে। শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্য লেখা শেষ করিয়া এই বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণে যাহা আছে তাহাও দেওয়া হইয়াছে।)

—*—



## পঞ্চম অধ্যায়
## উত্তম চরিত্র

হিমালয়ে অপরাজিতা স্তব।

পুরাকালে শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দুই দৈত্য অহঙ্কার পূর্ণ ছিল। গর্ব্ববলে তাহারা ইন্দ্রের ত্রৈলোক্য হরণ করিল। প্রত্যেক দেবতার স্ব স্ব অধিকার কাড়িয়া লইল। দেবতাগণ স্বর্গ হইতে তিরস্কৃত ও বিতাড়িত হইলেন। তখন দেবতারা পুনরায় রক্ষাকালী ভদ্রকালীকে স্মরণ করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে মহামায়া একবার আসিয়া জগতের পাপ নাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছিলেন, 'তোমরা সঙ্কটে পড়িয়া যখন আমাকে স্মরণ করিবে তখন আমি আসিয়া তোমাদের সঙ্কট মোচন করিব।"

সেই আশা করিয়া দেবগণ হিমালয় পর্ব্বতের প্রশান্ত দেশে গিয়া বিষ্ণুমায়ার স্তব করিলেন।

দেবগণ কহিলেন,—

দেবী মহাদেবী সর্ব্ব প্রকাশ তোমার, কল্যাণরূপিনী দেবী তোমায় বার বার নমস্কার করিতেছি। জগতের আদ্যাশক্তি, তুমি পালিকে, বরদে, মাতঃ আমরা সুসংযত, তোমার পদে প্রণাম করি। নিত্যা, গৌরী, ধাত্রী, ভীমা, জ্যোতিরূপা, চন্দ্ররূপা, সুখ-স্বরূপয়া, তোমায় নমস্কার করি।

বুদ্ধি সিদ্ধিরূপাকে নমঃ। লক্ষ্মী অলক্ষ্মীকে নমঃ। সর্ব্বাণি! তোমায় নমঃ। দুর্গা শ্রেষ্ঠা, খ্যাতি, কৃষ্ণা, সর্ব্বকারিণী, ত্রাণদায়িনী ধূম্রবরণী তোমায় নমঃ।

অতি সৌম্য, অতি রৌদ্রা, জগৎপ্রতিষ্ঠারূপা, ক্রিয়া-স্বরূপা তোমার চরণে নমো নমঃ।

যে দেবী চেতনা শক্তি, বিষ্ণুমায়া নামে খ্যাতা, সকল প্রাণীর মাঝে সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে নমো নমঃ। যে দেবী জাগ্রত ভাবে চেতনা নামে সর্ব্বভূতে রহিয়াছেন তাঁহাকে নমস্কার করি।

যে দেবী জগৎমাতা, বুদ্ধিরূপে প্রতিষ্ঠিতা, নিখিল প্রাণীর মাঝে পরাবুদ্ধি তাহাকে নমস্কার। যে দেবী চৈতন্যযুতা নিদ্রারূপে অবস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার।

যে দেবী সর্ব্বভূতে ক্ষুধারূপে অবস্থান করেন, তাঁহাকে নমঃ।

যে দেবী মায়ারূপে আমাদের মধ্যে আছেন তাঁহাকে নমঃ। যে দেবী শক্তিরূপে সকল প্রাণীর মধ্যে বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে নমঃ। যে দেবী বাসনারূপে সর্ব্বজীবের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমঃ। যে দেবী ক্ষমারূপে আমাদের অন্তরে নিহিত আছেন, তাঁহাকে নমঃ।

যে দেবী জগন্মাতা জাতিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমঃ।

যে দেবী লজ্জারূপে জীব মাঝে আছেন, তাঁহাকে নমঃ। যে দেবী শান্তিরূপে আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি। যে দেবী শ্রদ্ধারূপে আমাদের অন্তরে রহিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কান্তিরূপে প্রতিষ্ঠাতা, সেই জগৎমাতাকে নমস্কার করি। সেই জগৎমাতা যিনি লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতা তাঁহাকে নমঃ। যে দেবী বৃত্তিরূপে সংগোপনে রহিয়াছেন, তাঁহাকে নমো নমঃ। যে দেবী স্মৃতিরূপে সংগোপনে রহিয়াছেন তাঁহাকে নমস্কার করি।

যে দেবী দয়ারূপে অবস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার করি। যে দেবী সমস্ত ভূতে তুষ্টিরূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে নমো নমঃ।



যে দেবী জননী জগদ্ধাত্রী মাতা সকলের মধ্যেই সমভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি।

যে দেবী ভ্রান্তিরূপে আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন তাঁহাকে নমো নমঃ। যে দেবী অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সর্ব্বব্যাপি প্রাণসম, ইন্দ্রিয় ও ভূতগণ মধ্যে সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার। যে দেবী চৈতন্য জ্যোতিরূপা, যাঁর স্বরূপে স্থিতি, যিনি নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি।

আমরা রিপুর প্রতাপে তপ্ত, আমরা ভক্তিভাবে বিনয়াবনত হইয়া আপনার পূজা করিতেছি। পূর্ব্বে দেবতারা আপনার পূজা করিয়া ইষ্ট লাভ করিয়াছিল। আপনি আমাদের শান্তি করুন, হে দেবী, আমাদের কল্যাণ দান করুন।

মুনি কহিলেন,— যখন দেবগণ এইরূপে মাতৃস্তব করিতেছিলেন, তখন পার্ব্বতী ভুবনমোহিনীরূপে স্নান করিবার ছলে হিমাচলে জাহ্নবীর জলে ধীরে দেখা দিলেন। সুভ্রূযুতা গিরিসুতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবতারা কাহার স্তব করিতেছেন?' এই কথা বলিতে বলিতে, তাঁহার দেহ-কোষ হইতে শিবাশক্তি বাহির হইতে হইতে কহিলেন 'নিশুম্ভের পরাজিত, শুম্ভ দ্বারা বিতাড়িত দেবগণ সম্মিলিত হইয়া আমারই স্তব করিতেছেন। পার্ব্বতীর দেহ-কোষ হইতে জন্মিবার কারণ, সেই অম্বিকাদেবী, 'কৌষিকী' নামে এই ভুবনে কীর্ত্তিতা। পার্ব্বতী স্নান-ছলে অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কৌষিকীর বর্ণ কাল হইল, তাঁহার নাম হইল কালিকা। সেই দেবী কৌষিকী রূপ ধরিলেন বিশ্ব বিমোহিয়া; তাহা দেখিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড-মুণ্ড বিস্মিত হইল। তাহারা শুম্ভ-নিশুম্ভের

নিকট গিয়া দেবীর রূপ বর্ণনা করিল এবং বলিল, "তোমরা সকল দেবতাদের শ্রেষ্ঠ দ্রব্য হরণ করিয়াছ এখন সেই অপরূপ নারীকে গ্রহণ কর।"

এই সকল কথা শুনিয়া শুম্ভ তাহার দূত সুগ্রীবকে মোহের আবেশে দেবীকে আনিবার জন্য পাঠাইল। মৃদুবাক্যে সেই দেবীকে আনিতে বলিল। দূত গিয়া দেবীকে বলিল, শুম্ভ ত্রৈলোক্যের স্বামী, সব দেবতাকে পরাজিত করিয়া তাহাদের স্ব-স্ব যজ্ঞভাগ ভোগ করিতেছেন। আপনি সেই শুম্ভের ভজনা করুন, তাহা হইলে অতুল ঐশ্বর্য্য পাইবেন।

জগতের ধাত্রী দুর্গা ভদ্রা ভগবতী, এই সকল কথা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এই কথাগুলি সত্য, কিন্তু আমি পণ করিয়াছি যে, যে আমায় যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে আমি তাহারই নারী হইব" এবং আরও বলিলেন, 'তুমি গিয়া শুম্ভকে সত্বর এই কথা বল; সে তাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুক।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## ধূম্রলোচন বধ

দূত মুখে এই কথা শুনিয়া শুম্ভ তাহার সেনাপতি ধূম্রলোচনকে সেই দেবীকে কেশ আকর্ষণ করিয়া আনিবার জন্য পাঠাইলেন। ধূম্রলোচন দেবীকে দেখিয়া তাঁহার দিকে ছুটিতে, দেবী অগ্নিসম রোষে হুঙ্কার ছাড়িলেন। তাহাতে ধূম্রলোচন ভস্ম হইয়া গেল। দেবীর-বাহন সিংহ তাহার সৈন্যদের নিহত করিল। তখন শুম্ভ চণ্ড-মুণ্ডকে পাঠাইল দেবীকে ধরিয়া আনিবার জন্য।

—::—



## সপ্তম অধ্যায়

## চণ্ড-মুণ্ড বধ

চণ্ড-মুণ্ড বহু সৈন্য লইয়া দেবীকে ধরিয়া আনিবার জন্য বাহির হইল। সেই দৈত্যদ্বয়কে দেখিয়া দেবী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার বদন মসী-বর্ণ হইল। তাঁহার ভ্রূকুটি ললাট হইতে এক অসম্ভবা নারী নির্গতা হইলেন। অট্ট অট্ট হাস্য করিতে করিতে, সেই কালী করাল-বদনা, করে খড়্গ, গলে শবমালা, খট্টাঙ্গ ধারিণী, চর্ম্মবাস, শুষ্ক মাংস, ভীমা-উন্মাদিনী, বিস্তৃত-বদন, লোল-জিহ্বা লিহ লিহ, আরক্ত-কোটর-নেত্র, ভীষণ হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। সেই দেবী দৈত্যগণ মাঝে পড়িয়া অসুর নাশ করিতে লাগিলেন এবং অশ্ব, রথ, সারথি, অস্ত্র বদনেতে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই সমস্ত সৈন্য নিহত হইতে দেখিয়া, চণ্ড-মুণ্ড দেবীর প্রতি ধাবিত হইল এবং শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন সেই কালী ভৈরবনাদিনী ভীমা ভীষণ হাস্য করিয়া "সোঃ হং সোঃ হং" বলিয়া শ্বাস তুলিয়া চণ্ডকে বধ করিলেন। মুণ্ড দেবীর দিকে ধাবিত হইয়া আসিতে, তিনি ঊর্দ্ধে শ্বাস তুলিয়া তাহাকেও বধ করিলেন। তাহার পর চণ্ড-মুণ্ডের মস্তক দুইটি লইয়া গিয়া চণ্ডিকাকে নৈবেদ্য দান করিলেন, এবং বলিলেন 'আপনি স্বয়ং শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করুন।' চণ্ড-মুণ্ডের মস্তক দুইটি দর্শন করিয়া দেবী চণ্ডিকা কালিকাকে বলিলেন, 'তুমি আমায় চণ্ড-মুণ্ডের মস্তক দুইটি আনিয়া উপহার দিয়াছ, তুমি ত্রিলোকে 'চামুণ্ডা' নামে ঘোষিত হইবে।'

—*—

### অষ্টম অধ্যায়

## রক্তবীজ বধ

চণ্ড-মুণ্ড নিপাতিত হইলে, শুম্ভ সমস্ত দৈত্যকুলকে সমরের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দিল। কম্বুকে সেনাগ্রণী করিয়া ষড়শীতি সেনাপতি কোটি সৈন্য লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। ধূম্রবংশ কালক বংশ, দুর্হৃত বংশ, মূরবংশ প্রভৃতি অসুর সকল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল।

অগণ্য ভীষণ অসুর সৈন্য দেখিয়া দেবী ধনুর টঙ্কারে পৃথিবী, আকাশ পূর্ণ করিলেন। দেবীর সিংহ গর্জ্জন করিতে লাগিল। চামুণ্ডা ভীষণ শব্দ করিতে লাগিলেন। কেশরী ও চামুণ্ডা কালী চৌদিকে নিনাদ করিতে করিতে দৈত্য সৈন্য আক্রমণ করিলেন।

সেই সময় অসুর সৈন্যকে নিহত করিবার জন্য ও দেবতাদের রক্ষা করিবার জন্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, ইন্দ্র ও কার্ত্তিকের দেহ হইতে নিজ নিজ ভূষণ, বাহন ও রূপ লইয়া দেবী নির্গত হইলেন। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণীরূপে, শিব-শক্তি মাহেশ্বরীরূপে, কার্ত্তিক-শক্তি শিখীপরে কৌমারীরূপে, বিষ্ণু-শক্তি বৈষ্ণবী বরাহ মূর্ত্তি ধরিয়া এবং নর-সিংহ-শক্তি নারসিংহীরূপে আবির্ভূতা হইলেন। ইন্দ্র ঐন্দ্রী-শক্তি রূপে বজ্র হাতে লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সকল দেবী শক্তির মধ্যে উপস্থিত হইয়া ঈশান চণ্ডিকাকে বলিলেন, 'শীঘ্র অসুর ধ্বংস কর।' তখন দেবী দেহ হইতে অতি ভীষণা, অত্যুগ্রা, অসংখ্য ঘোররবা শৃগালী বেষ্টিতা চণ্ডিকা শক্তি আবির্ভূতা হইলেন।

দেবী আশুতোষকে বলিলেন, 'তুমি দূত হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট যাও এবং তাহাদের বল, যেন তাহারা ইন্দ্রের অধিকার এবং



দেবতাদের হবিঃভোগ ছাড়িয়া পাতালে প্রবেশ করে, নচেৎ যদি যুদ্ধ চায়, তাহা হইলে শিবাগণ তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিবে'।

দেবী সাক্ষাৎ শিবকে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া দেবীর নাম হইল 'শিবদূতী'।

দেবী দূত মুখে সেই খবর পাইয়া দৈত্যেরা ক্রুদ্ধ হইয়া দেবী প্রতি বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিল। ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী প্রভৃতি সকলে দৈত্য-সৈন্য নিহত করিলেন।

তখন রক্তবীজ গদা লইয়া আক্রমণ করিল। রক্তবীজের এক বিন্দু রক্ত মাটিতে পড়িলে শত শত রক্তবীজ তাহা হইতে বাহির হইতে লাগিল। সকল রক্তবীজ মিলিয়া গদা লইয়া দেবী শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; অগণন রক্তবীজে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত হইল। দেবীশক্তিদের ভীত হইতে দেখিয়া, চণ্ডিকা চামুণ্ডাকে বদন বিস্তৃত করিয়া রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে বলিলেন, যাহাতে একবিন্দু রক্তও মাটিতে না পড়ে। চামুণ্ডা তাহাই করিলেন এবং রক্তবীজের রক্ত মুখে ধারণ করিতে লাগিলেন। রক্তপাতজনিত যত রক্তবীজ বহির্গত হইতে লাগিল, শোণিত সহিত কালী তাহা গ্রাস করিতে লাগিলেন। রক্তবীজ রক্তহীন হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং তাহার আয়ু শেষ হইয়া গেল। রক্তবীজের মৃত্যুতে দেবতারা খুব আনন্দিত হইলেন।

—*—

### নবম অধ্যায়

## নিশুম্ভ উদ্ধার

সকল দৈত্য-সৈন্য হত ও রক্তবীজ নিহত দেখিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ ক্রোধে অধীর হইল এবং মুখ্য সেনা সকল লইয়া দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। দেবীর শরাঘাতে নিশুম্ভ মূর্চ্ছিত হইল। তখন শুম্ভ

দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। দেবীর সহিত শুম্ভের ভীষণ যুদ্ধ হইল। দেবীর শূলাঘাতে শুম্ভ মর্ম্মাহত হইল। তখন নিশুম্ভ চেতনা পাইয়া আবার দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তীক্ষ্ণ শূল দ্বারা দেবী নিশুম্ভের বক্ষস্থল বিদারিত করিলেন এবং তাহার অর্দ্ধোত্থিত শির দেবী কাটিয়া ফেলিলেন। তখন সকলে মিলিয়া সমস্ত দৈত্যসেনার প্রাণনাশ করিলেন।

—*—

দশম অধ্যায়

## শুম্ভ উদ্ধার

নিশুম্ভ ও দৈত্য-সেনা সকল নিহত হইলে, শুম্ভ সহসা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল 'হে দুর্গে তুমি দেবশক্তির দ্বারা বলান্বিত হইয়া বলগর্ব্বিত হইয়াছ'। দেবী বলিলেন, 'আমি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কিছুই নাই, সকলই আমারই বিভূতি।' এই বলিবামাত্র, সকল দেব-শক্তি দেবীদেহে বিলীন হইয়া গেল। দেবী বলিলেন, 'আমি একাই তোমার সহিত যুদ্ধ করিব'। তখন দেবীর সহিত শুম্ভাসুরের ভীষণ যুদ্ধ হইল। অবশেষে দেবী শূল দ্বারা দৈত্যের বক্ষ বিদারিত করিলেন। মহারিপু শুম্ভ নিপাত হইল। জগৎ সুস্থ হইল, আকাশ নির্ম্মল হইল, গ্রহ, তারা, রবি, শশী বিকশিত হইল। অশুভ জলদ সকল-গত হইল, উল্কা-সকল শান্ত হইল, এবং ত্রিপথ-গামিনী-গঙ্গা ত্রিবেণীতে প্রবাহিত হইল। দেবগণ হর্ষান্বিত হইল, গন্ধর্ব্বেরা গীত বাদ্য করিতে লাগিল এবং অপ্সরারা নৃত্য করিতে লাগিল।

পুণ্যময় বায়ু বহিতে লাগিল, যজ্ঞ অগ্নি শান্তিময় নির্ধূম হইল। দিক্‌মণ্ডল শান্ত হইল।



একাদশ অধ্যায়

## নারায়ণী স্তুতি

শুম্ভ নিশুম্ভ নিহত হইলে পর দেবতারা অগ্নিকে অগ্রে রাখিয়া ইন্দ্রের সহিত একযোগে দেবী কাত্যায়নীর স্তব করিলেন—বলিলেন, হে দেবী 'ত্রিলোকবন্দিনী, প্রসন্না হও, বিপত্তারিণী লোক—বাঞ্ছা পূর্ণ কর।'

দেবী বলিলেন, 'কলিযুগে সন্ধিকালে বৈবস্বত মনুর অধিকার সময়ে অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক চতুর্যুগে, শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে অন্য দৈত্যদ্বয় জন্মগ্রহণ করিবে। আমি নন্দের আলয়ে যশোদার গর্ভে জন্ম লইয়া বিন্ধ্যবাসিনী হইয়া তাহাদিগকে নাশ করিব।'

আবার জন্মিয়া বিপ্রচিত্তি বংশের দানব সকলকে নাশ করিব, তখন আমার দন্ত সকল দাড়িম্ব কুসুমের মত রক্তবর্ণ হইবে। এইজন্য দেবতা ও মানবগণ আমায় 'রক্তদন্তিকা' বলিয়া বর্ণনা করিবে।

যখন শতবর্ষ অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী জলশূন্যা হইবে, তখন মুনিগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া শতনেত্রে স্তবকারী মুনিগণকে নিরীক্ষণ করিব। তখন তাঁহারা আমায় 'শতাক্ষী' বলিয়া কীর্ত্তন করিবে।

যতদিন অনাবৃষ্টি থাকিবে, আমি স্বদেহজ শাকে বিশ্বপালন করিব। তখন আমার নাম হইবে 'শাকম্ভরী'। সেই সময় দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করিয়া আমার নাম হইবে 'দুর্গা'। পুনরায় হিমাচলে মুনিগণকে রক্ষার জন্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব। তখন আমার নাম হইবে 'ভীমাদেবী'। যখন অরুণাসুর ত্রিভুবনে বিঘ্নকারী হইবে, তখন অসংখ্য ভ্রমররূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বধ করিব। তখন আমার নাম হইবে 'ভ্রামরী'।

যখনই জগতে রিপুর পীড়ন হইবে, তখনই আমি ধরাতে অবতীর্ণ হইয়া রিপুনাশ করিয়া সকলকে শাস্তি দিব।

—::—

### দ্বাদশ অধ্যায়

## ভগবতীর-বাক্য

দেবী বলিলেন, 'যে সমাহিত চিত্তে আমার সন্তোষ সাধন করিবে, আমি তাহার সর্ব্ব-বিঘ্ন মোচন করিব।'

মধু-কৈটভের উদ্ধার, মহিষাসুর উদ্ধার, শুম্ভ-নিশুম্ভ-মুক্তি আমার শক্তিযোগে যে অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং সকল শুভ-দিনে, ভক্তিভরে একমনে কীর্ত্তন করে, তাহার পাপ, বিঘ্ন থাকিবে না। আমার কথা যে শ্রদ্ধাভরে কীর্ত্তন করে, তাহার পাপজ আপদ সম্ভব হয় না; দারিদ্র বা বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটে না। শত্রু, দস্যু, রাজভয়, শাস্ত্রভয় হয় না। অনলে, সলিলে ভয় হয় না। সেজন্য আমার মাহাত্ম্য নিত্য প্রাণ-মন দিয়া পড়িবে বা শুনিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন। যে গৃহে প্রত্যহ উচ্চরবে চণ্ডীপাঠ হয় সে গৃহ আমি ছাড়ি না।

পাঠের নিয়ম যদি কেহ না জানে, তাহা হইলে যে ভাবেই আমার মাহাত্ম্য পাঠ করে তাহাতেই আমার আনন্দ হয়।

আমার মাহাত্ম্য শ্রবণে জীব মুক্ত হয়। তোমাদের স্তব, ব্রহ্মর্ষিগণের স্তব ও পদ্মযোনী স্তুতি পাঠে শুভমতি হয়। আরও অনেক কিছু বলিলেন, নিজ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে।

ঋষি বলিলেন, "সম্মুখস্থ দেব সকলকে এই সকল বলিতে বলিতে দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। হে রাজন্, তিনি নিত্যা ও স্থির সত্য। তথাপি বিশ্ব রক্ষার জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করেন।



তিনিই এই বিশ্ব প্রসব করেন, প্রার্থনা করিলে তুষ্ট হইয়া তত্ত্বজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য সম্ভার দান করেন। প্রলয়কালে তিনি মহামারী স্বরূপিনী, শুভকালে লক্ষ্মীরূপে ধন-ধান্য দেন। তিনি অন্তর্হিতা হইলে অলক্ষ্মীরূপে সর্ব্বনাশ হয়। তাঁহার ভক্তেরা যদি সমাহিত চিত্তে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ দ্বারা তাঁহার ভক্তিভরে পূজা করে, তাহা হইলে, সেই মহাশক্তি মহামায়া ধর্ম্মে মতি, ধন ও পুত্রাদি দান করেন।

—●—

### ত্রয়োদশ অধ্যায়

## বরদান

ঋষি বলিলেন, রাজা তোমাদিগকে ঐ দেবীর মাহাত্ম্য কথা বলিলাম। এই দেবী বিষ্ণুমায়া জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। তোমাকে বৈশ্যকে অবিবেকী সংসারের সকলকে বিমোহিত করিতেছেন। তিনি ভোগ-মোক্ষ-প্রদা। তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লও।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই রাজা সুরথ ও বৈশ্য সেই মেধসমুনির নিকট দেবী মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, নদীতীরে গমন করিয়া দেবী দর্শনের আশায়, দেবী-সুক্ত জপ করিয়া তপস্যায় রত হইলেন। মৃত্তিকার মূর্ত্তি করিয়া, হোম, পূজা, ধূপ, দীপ দিয়া পূজা করিলেন। কখনও বা সংযতাহারে, কখনও বা নিরাহারে থাকিয়া, নিজের শোণিত উৎসর্গ করিয়া তিন বৎসর দেবীর আরাধনা করিলেন।

দেবী তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি বর চাও?" রাজা চাহিলেন এই জন্মে নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার এবং পরজন্মে দীর্ঘকালস্থায়ী রাজ্যভোগ। বৈশ্য চাহিলেন, মোহনাশকারী

আত্মজ্ঞান। দেবী কহিলেন,— 'রাজা তুমি এজন্মে শীঘ্রই নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইবে এবং পরে সূর্য্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণিক মনু নামে খ্যাত হইবে।' বৈশ্যকে বলিলেন, 'তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অক্ষয় অনন্ত শান্তি লাভ করিবে।'

তাঁহারা দুইজন মনোমত বর প্রাপ্ত হইয়া দেবীকে প্রণাম করিল। সেই মহাশক্তি মহামায়া তখন অন্তর্হিতা হইলেন। এইরূপে সুরথ রাজা দেবী বর লাভ করিয়া সূর্য্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণি মনু হইবেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য সংক্ষেপে এইখানে সমাপ্ত করিলাম।

—●—

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সব পুরাণে মহিষাসুর বধের কাহিনী এক রকম নয়।

বরাহ পুরাণে আছে, মহিষাসুর ঋষি সিন্ধু দীপের ঔরসজাত দানবরাজ নন্দিনী মহিষ্বতীর পুত্র। একদা ঋষি সিন্ধুদীপ মহিষ্মপুরীর নিকট এক বনে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। সেই সময় অসুররাজ বিপ্রচিত্তির কন্যা মহিষ্মতী সখি সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সকলেই মহিষরূপ ধারণ করিয়া আশ্রমবাসীদের আক্রমণ করিল। ধ্যানস্থ ঋষি বিরক্ত হইয়া অভিশাপ দিলেন,— তোমরা মহিষরূপে আশ্রমবাসীদের নির্য্যাতন করিবার অহঙ্কার ফিরিয়া পাইবে না।" ভুল বুঝিয়া তাহারা ঋষির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তিনি ক্ষমা করিলেন, কিন্তু বলিলেন, যেদিন মহিষ্মতীর গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সেদিন তাহারা শাপমুক্ত হইবে।



একদা স্বর্গের অপ্সরা ইন্দুবতী নর্ম্মদায় স্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া স্বর্গাভিমুখে চলিয়া গেলেন, তাহা দেখিয়া স্নানরত ঋষির রেতঃ স্খলন হইয়া নদীর জলে পতিত হইল। সেই সময় নদীর নিম্ন স্রোতে দাঁড়াইয়া শাপদগ্ধা মহিষরূপী মহিষ্মতী জলপান করিতেছিল ও জলের সহিত ঋষির ধাতু পান করিল। তাহা হইতে অন্তঃসত্ত্বা হইয়া মহিষাসুরের জন্ম দিয়া শাপমুক্ত হইল। মহিষাসুর মাতামহের উত্তরাধিকারী হইলেন। বড় হইয়া সে ঋষি কর্তৃক মাতার অবমাননার কথা ভুলিতে পারিল না। তাই সে প্রতিশোধ লইবার জন্য গভীর তপস্যা করিয়াছিল। মহাদেব তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলেন। মহিষাসুর বর চাহিল,— দেবনর-যক্ষ-রক্ষ সে কাহারও নিকট পরাজিত হইবে না। বর পাইয়া মহিষাসুর সমগ্র মর্ত্য, পাতাল জয় করিয়া, স্বর্গের দিকে নজর দিল। বিষ্ণুর শক্তি, বৈষ্ণবীর রূপের বর্ণনা নারদের মুখে শুনিয়া তাঁহার নিকট দূত পাঠাইল। তিনি প্রত্যাখ্যান করাতে মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিল। পদ্মপুরাণে ঐ দেবী বৈষ্ণবী শক্তিই মহিষাসুর বধ করিয়াছিলেন।

বামন পুরাণে পুলস্ত্য-নারদ উপাখ্যানে আছে, দেবগণ মহিষাসুর কর্তৃক পরাজিত হইয়া ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর নিকট গিয়া সব কিছু জানাইলেন। বিষ্ণু শঙ্করকে ধ্যানে আহ্বান করিলেন। সম্মিলিত দেবগণের নয়ন হইতে রোষবহ্নি বাহির হইয়া জ্বলন্ত পর্ব্বত প্রমাণ হইল। সেই অগ্নি হইতে আদ্যাশক্তি দশভুজা মহিষাসুরমর্দ্দিনী বাহির হইলেন। তাঁহার প্রতিটি অঙ্গই এক এক দেবতার অঙ্গ হইতে সৃষ্টি হইল। প্রতি দেবতাই স্ব স্ব শ্রেষ্ঠ ভূষণ ও অস্ত্র দ্বারা দেবীকে সজ্জিত করিলেন। অতঃপর সিংহবাহিনী হইয়া

দেবী আদ্যাশক্তি বিন্ধ্য প্রদেশে গমন করিলেন। তথায় চণ্ড-মুণ্ড অসুরদ্বয় তাঁহার অচিন্ত্যরূপ দর্শন করিয়া মহিষাসুরের নিকট গমন করিয়া বলিল, ঐ রূপ বর্ণনাতীত। তাহা শুনিয়া মহিষাসুর ময়দানবের পুত্র দুন্দুভিকে দেবীর নিকট দূতরূপে পাঠাইল। দেবী দূতকে বলিলেন, কুলপ্রথা অনুযায়ী যুদ্ধে পরাজিত করিতে না পারিলে তিনি মহিষাসুরের পাণি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তাহার পর যুদ্ধের বৃত্তান্ত ও মহিষাসুর বধ। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ড-মুণ্ডের কথা আছে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের কাহিনীতে, বহু যুগ যুগান্তরের পরের কথা।

—::—

"হিমাচল-সুতা-নাথ সংস্তুতে পরমেশ্বরী" শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রসিদ্ধ "আনন্দলহরী" স্তোত্রে শিব-শক্তি রহস্যের কথা বলিয়াছেন।

আদ্যাশক্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের সৃষ্টাদি কাজের সাহায্যের জন্য নিজ নিজ অংশ হইতে ব্রহ্মার জন্য ব্রহ্মাণী শক্তি, বিষ্ণুর জন্য বৈষ্ণবী শক্তি লক্ষ্মী সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে দান করিলেন। শিবের জন্য নিজ অংশ হইতে কিছু সৃষ্টি করিলেন না। পরন্তু স্বয়ং শিবের গৃহিণী হইলেন। মহাদেব ইহা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলেন এবং মহামায়ার তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া উন্মাদ হইয়া উদাসীন হইলেন। শিব মহামায়াকে বলিলেন,—'কথং ত্বং জননী-ভূত্বা, মম বধূরূপেন সংস্থিতা। উক্ত্বা চোক্ত্বা ভাবয়িত্বা ভিক্ষুকোঽহং নগাত্মজে।'

শিবের বুকে শ্যামা মাকে দেখিয়া রামপ্রসাদ গান গাহিয়াছেন,—

"বাজবে গো মহেশের বুকে
নেবে দাঁড়া না ক্ষেপা মাগি॥



মরেন নাই শিব আছেন বেঁচে
যোগে আছেন মহাযোগী।
বিষ খেয়ে যার হয়নি মরণ
সে মরবে আজ কিসের কারণ,
"রামপ্রসাদ" বলে কপট মরণ
অভয় চরণ পাবার লাগি॥"

—::—

শ্রীশ্রীচণ্ডীর তিন ভাগ :—

১ম ভাগ=দেবী সুক্ত, অর্গলা স্তোত্র, কীলক ও চণ্ডীকবচ। এইগুলি পাঠ করিয়া তারপর দ্বিতীয় ভাগ মূল গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। তৃতীয় ভাগ পরিশিষ্ট।

দেবী সুক্ত=অভৃণ নামে মহর্ষির 'বাক' নামে এক ব্রহ্মবিদুষী কন্যা ছিলেন— তিনি আত্ম উপলব্ধি করিয়া— স্বমুখে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেবীসুক্ত ঋক্‌বেদের অন্তর্গত।

অর্গলা স্তোত্র=অর্গল=খিল বা হুড়কা। কীলক=শাপ বা চাবিও বুঝায়। কবচ=বর্ম্ম বা অঙ্গত্রাণ।

শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠের পূর্ব্বে অর্গলা স্তোত্র, কীলক ও তৎপরে দেবী-কবচ পাঠ আবশ্যক। ইহার অর্থ কি? উত্তর : আমাদের কামনার বাসনার শেষ নাই। যত পাই তত চাই। চাওয়ার কোনও শেষ নাই। এই কামনাই আমাদের যত দুঃখের মূল। কিন্তু পার্থিব কামনা বাসনা থাকিতে, ঈশ্বরের প্রতি ধ্যান দেওয়া অসম্ভব। এই কামনা, বাসনা, আমাদের ইন্দ্রিয় সকল, মন ও বুদ্ধির উপরই প্রতিষ্ঠিত। যদি কোনও প্রকারে এই কামনা বাসনাগুলিকে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে

নামাইয়া দিতে পারা যায় তাহা হইলে, সমগ্র ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দিয়া আমরা ঈশ্বর উপাসনা করিতে সমর্থ হইতে পারি। অর্গলা স্তোত্রের অর্থ দরজা খুলিয়া দেওয়া। আমরা হৃদয়ের দরজা খুলিয়া দিয়া, মায়ের চরণে যত কামনা-বাসনা তৃপ্তি করিয়া চাহিলাম, চাহিবার আর কিছুই বাকী রহিল না। রূপং দেহি জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি।'

যে মুহূর্ত্তে সব চাওয়া মায়ের চরণে সমর্পণ করিলাম সেই মুহূর্ত্তেই আবার কীলক মন্ত্রে দরজা বন্ধ করিতেছি। সব কিছু চাওয়ার পালা শেষ করিয়া মহাদেবের স্তব করিয়া তাঁরই কৃপায় দরজা বন্ধ করিতেছি। যাহাতে সেই কামনা বাসনাগুলি আমায় আপাততঃ জ্বালাতন করিতে না পারে। কামনা-বাসনা মায়ের চরণে রাখিলাম, তারপর দরজা বন্ধ করিলাম। এবার অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ সকল রহিল গেল। এইগুলিও অসুস্থতাবশতঃ আমাদের অস্থির করিতে পারে এবং ঈশ্বর উপাসনায় বাধা দিতে পারে; সেইজন্য দেহের প্রতিটি অঙ্গে, মন বুদ্ধি অহঙ্কারে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা দশ দিক আদি দেবী কবচ পাঠে দেবীকে রক্ষা করিতে বলিয়া, নিজে সর্ব্ব বিষয়ে সুরক্ষিত হইয়া শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ আরম্ভ করিলাম, যাহাতে কোনও রকম বাধা আসিতে না পারে।

এইরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বাধামুক্ত হইয়া ঈশ্বর উপাসনা আর কোনও ধর্ম্মেই দেখা যায় না। কামনা-বাসনা-শূন্য হইয়া দৈহিক মানসিক সর্ব্বপ্রকার বাধামুক্ত হইয়া চণ্ডীপাঠের জন্য, সর্ব্বপ্রথম, চণ্ডীধ্যান শেষ করিয়া, অর্গলা স্তোত্র, তারপর কীলক এবং তারপর দেবী-কবচ পাঠের ব্যবস্থা।

—*—



## তন্ত্র

মহাদেবের সাধনার সিদ্ধি প্রভাবে লব্ধ অনুষ্ঠান রাশির সমন্বয় অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র। মহেশ্বরের পঞ্চমুখ নিঃসৃত যে জ্ঞান গঙ্গোত্রীর পাঁচটি ধারা ভারত ও জগৎ প্লাবিত করিয়াছে, তাহারই একটি তন্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্রের ত্রিধারা—আগম, যামল ও তন্ত্র।

আগম=সৃষ্টি, প্রলয়, দেবগণের পূজা, সাধনা পুরশ্চারণ, ষট্-কর্ম্ম-সাধন, চতুর্ব্বিধ ধ্যানযোগ, এই সপ্তলক্ষণের নাম আগম।

যামল= সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্যোতিষবিদ্যা, নিত্যকৃত্য, ক্রম, সূত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ, যুগধর্ম্ম এই আটটি লক্ষণের নাম যামল।

তন্ত্র= সৃষ্টি, লয়, মন্ত্রনির্ণয়, দেবতাদিগের সংস্থান, ভূতদিগের সংস্থান, যন্ত্রনির্ণয়, বিবুধগণের উৎপত্তি, তরু উৎপত্তি, কল্প-বর্ণন, জ্যোতিষ সংস্থান, পুরাণ বিবৃতি, কোষকথন, ব্রতকথা, শৌচাশৌচ কথন, প্রকৃতি-পুরুষের লক্ষণ, রাজধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, ব্যবহারিক ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা বর্ণনা প্রভৃতি লক্ষণের নাম তন্ত্র।

সদ্‌গুরুর সকাশে উপবিষ্ট না হইয়া তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলন করিলে সিদ্ধিলাভ দূরে থাকুক, অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এইজন্যই বিশেষভাবে তন্ত্রের কিছু লেখা হইল না।

তন্ত্রে গুরুর লক্ষণ, শিষ্যের লক্ষণ দেওয়া আছে। দীক্ষার আবশ্যকতা ও তাহার নিয়মাবলী দেওয়া আছে। ইহা অতি কঠিন শাস্ত্র। সদ্‌গুরুর উপদেশ ছাড়া এ শাস্ত্র পাঠ করা উচিত নহে।

তন্ত্রের মন্ত্রগুলি সবই শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন। তন্ত্রের সহিত বেদ-বেদান্তের কোনও সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। তবে বেদের মন্ত্রই তন্ত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান কি-না তাহা ধরিবার কোনও

উপায় আছে কি না তাহা আমার জানা নাই। পার্ব্বতীর প্রশ্ন ও মহাদেবের উত্তর, ইহাই তন্ত্রশাস্ত্র। একথাও ঠিক যে, তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মই নানাভাবে বাঙ্গলার ধর্ম্ম। বৈদিক ধর্ম্মের প্রভাব বাঙ্গলা বা বাঙ্গালীদের মধ্যে বিশেষ নাই।

বাঙ্গালা মুলুকে বৈষ্ণবেরাও তন্ত্রের ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া চলে। সকলেই দুর্গাপূজা, কালীপূজা করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও তন্ত্রের ধর্ম্ম পৃথক থাকিয়াও কেমন যেন এক সঙ্গে সকলের মধ্যে চলিতেছে। বাঙ্গালী ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণ-কালী এক হইয়া আছেন।

আগম মন্ত্র বিলাসে স্বতন্ত্র, ফেৎকারীতন্ত্র, উত্তরতন্ত্র, ভৈরবীতন্ত্র প্রভৃতি ৬৪টি তন্ত্র আছে। তাছাড়া বহু তন্ত্রগ্রন্থও আছে। যথা,—মৎস্যসূক্ত, কূলসূক্ত, কামরাজ, যোগিনীহৃদয়-দীপিকা প্রভৃতি প্রায় দেড়শত।

বারাহীতন্ত্রে মুক্তক, শারদা, বামকেশ্বর প্রভৃতি ৫৪টি তন্ত্র আছে। এগুলি ছাড়া বৌদ্ধবিরচিত অসংখ্য বৌদ্ধতন্ত্র আছে।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে উক্ত আছে,—বৈদিক মন্ত্র সকল এ যুগে বিষহীন সর্পের ন্যায় নির্বীজ্য। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে যে সকল বৈদিক মন্ত্র সফল হইত, এখন তাহা মৃত্যুতুল্য। ভিত্তিগাত্রে চিত্রিত পুত্তলিকা যেরূপ সকল ইন্দ্রিয় সম্পন্ন হইয়াও স্বকার্য্য সাধনে অসমর্থ, কলিতে তন্ত্র ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্র সমুদায় প্রায় সেইরূপ। বন্ধ্যা স্ত্রীর সঙ্গমে যেমন ফল-উৎপত্তি হয় না, বৃথা শ্রমমাত্র সার হয়—সেইরূপ অন্য মন্ত্র দ্বারা কার্য্য করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, কেবল শ্রম সার। কলিকালে অন্য শাস্ত্রোক্ত বিধির দ্বারা যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নির্ব্বোধ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া গঙ্গাতীরে



কূপ খনন করে। কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র শীঘ্র ফলপ্রদ—জপ, যজ্ঞ সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠানেই প্রশস্ত।” তন্ত্র সম্বন্ধে যাহা সাধারণের জানা দরকার তাহা মাঝে মাঝে আবার লিখিব। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত ‘বৃহৎ তন্ত্রসার’ পাঠ করিলে তন্ত্র সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায়। কিন্তু শুধু পুস্তক পাঠের জিনিস তন্ত্রশাস্ত্র নহে। আপাততঃ তন্ত্র সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই থাক। তান্ত্রিক সাধনার আরম্ভ যৌবনে; সুস্থ শরীর, সবল মন ভিন্ন তন্ত্র সাধনা সম্ভব নহে। তান্ত্রিক সাধনা ভোগ ও ত্যাগের আধ্যাত্মিক সংমিলন। ইহা ত্রিবিধ, —পশুভাব, দিব্যভাব ও বীরভাব। ইহার মধ্যে পঞ্চ ‘ম’-কার লইয়া সাধনা বীরভাব।

## গীতা

মহাভারতের প্রসঙ্গে গীতার কথা বলিয়াছি, আবার বলিতেছি:

গীতোক্ত যোগের লক্ষ্য ভগবানের শরণাগতি-রূপ পরম পুরুষার্থ সহ ভগবৎ প্রেমে তন্ময়তা লাভ।

প্রকৃত গীতা আরম্ভ হইয়াছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক হইতে—আত্ম-তত্ত্বের কথা। মৃত্যুতে কাহারও শোক করা উচিত নয়। দেহ নশ্বর; আমি বলিতে যে আত্মা তাহা অবিনাশী। তবে অবিনাশী বলিয়া যুদ্ধে নরহত্যা কি পাপ নহে? ইহার উত্তর, ফলকামনা বর্জ্জন করিয়া, লাভালাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করিলে পাপের ফলভোগ করিতে হয় না। এই বুদ্ধি-যোগকেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বলে।

যদি রাজ্যলাভের জন্য যুদ্ধ কর, তাহা হইলে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক কাম্য-কর্ম্মের ফল।

যিনি সংযতেন্দ্রিয়, বিষয়-বাসনা, আত্মাভিমান ও মমত্ববুদ্ধি বর্জ্জন পূর্ব্বক ঈশ্বর চিন্তায় একনিষ্ঠ, তিনিই 'স্থিতপ্রজ্ঞ'। স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে আবদ্ধ হয় না। ইহার নামই 'ব্রাহ্মীস্থিতি'। যিনি ভগবানের অনন্যভক্ত, তিনিই ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া 'স্থিতপ্রজ্ঞ' হইতে পারেন।

### তৃতীয় অধ্যায়

এখানে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যদি কর্ম্ম হইতে সামাবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে হিংসাত্মক কর্ম্মে কেন প্রবৃত্ত হইব? তাহাতে ভগবান্ বলিলেন, সাংখ্যের সন্ন্যাস মার্গে যে মোক্ষলাভ হয়, তাহা জ্ঞানের ফলে, সন্ন্যাসের ফলে নহে। কর্ম্মযোগের দ্বারা যে মোক্ষ হয়, তাহাও সমত্ববুদ্ধি বা সম্যক জ্ঞানের ফল। সম্যক জ্ঞান ব্যতীত নিষ্কাম কর্ম্ম হয় না। কর্ম্ম কেহ ত্যাগ করিতে পারে না। প্রকৃতির গুণে মানুষ বাধ্য হইয়াই কর্ম করিবে।

মনে ত্যাগই ত্যাগ, বাহ্যতঃ ত্যাগ ত্যাগ নহে। কর্ম্ম যখন করিতেই হইবে, তখন কর্ত্তব্য কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্ব্বক, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিলে, কর্মফল ভোগ করিতে হয় না।

রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইলে ইন্দ্রিয়গণ মানুষকে বিপথে লইয়া যায়। স্বধর্ম অঙ্গহীন হইলেও পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কামনাই সকল অনর্থের মূল। পরমেশ্বরে চিত্ত সমাহিত করিলে কামনা জয় করা যায়। কামনা জয় হইলে নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং॥ ৩।৪৩

—*—



### চতুর্থ অধ্যায়

ভগবান্ বলিলেন, যখনই ধর্মের গ্লানি হয় ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি দেহ ধারণ করি। সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতগণের বিনাশ ও ধর্মসংস্থানের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই! জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মী, সকাম উপাসক, নিষ্কাম উপাসক, যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইভাবেই তুষ্ট করি। কর্মতত্ত্ব বড়ই দুরূহ।

(এই চতুর্থ অধ্যায়ে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে।)

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া গুরুপদে প্রণাম, আত্মবিষয়ক প্রশ্ন ও গুরুসেবাদি জ্ঞানলাভের বহিরঙ্গ সাধন। শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠা ও আত্ম-সংযম এইগুলি জ্ঞানলাভের অন্তরঙ্গ সাধন।

ভগবান বলিলেন, আত্মজ্ঞান দ্বারা সংশয় ছেদন করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর, যুদ্ধ কর, স্বধর্ম পালন কর।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ ৪।২৪

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪।৪২

### পঞ্চম অধ্যায়

এখানে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়, ইহাই প্রশ্ন। উভয়ই মোক্ষপ্রদ। ভগবান বলিলেন, কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ, কেন না, ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে সন্ন্যাসের ফল পাওয়া যায়। লোকরক্ষা ও বিশ্বকর্ম্মও সম্পন্ন হয়। যিনি ধ্যানযোগে মনকে বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া আত্মসংস্থ করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত বন্ধন-মুক্ত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ইহাকে ধ্যান-

যোগ বলে। (এই অধ্যায়ের ২৭-৩০ শ্লোক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ৪।২৭
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।
স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥ ২৯
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ॥ ৩০

(মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ুর গমনই 'প্রাণগতি' ও ভিতরে আসার নাম অপানগতি। এই উভয় গতিরোধই 'কুম্ভক'।

—●—

## ষষ্ঠ অধ্যায়

কামনা ত্যাগই যোগের মূল। যোগারূঢ় হইলে চিত্তের সমতাই ব্রাহ্মীস্থিতিতে নিশ্চল থাকার কারণ। চঞ্চল মনকে নিরোধ করা একান্ত দুঃসাধ্য। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা ও তীব্র বৈরাগ্যের দ্বারা উহা সাধন করা যায়। যোগভ্রষ্ট মানুষেরও সদগতি হয়। শুভ-কর্ম্মকারী কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যোগভ্রষ্ট পুরুষ সদাচার-সম্পন্ন ধনীর গৃহে অথবা জ্ঞানবান্ যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্ব্ব জন্মের যোগাভ্যাসজনিত শুভ সংস্কার বশতঃ যোগমার্গে আকৃষ্ট হন। এই অধ্যায়ে কিভাবে ধ্যান করিতে হয় তাহাও দেওয়া আছে।

"যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬।৪৭

—*—



## সপ্তম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, আমি কে? তাহার সমগ্র স্বরূপ কি? কি ভাবে তাহাকে ভাবনা করিতে হয়?

ভগবান্ বলিয়াছেন,—আমার দুই প্রকৃতি, অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম। পরা প্রকৃতি জীবভূতা—উহাই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছে। এই দুই প্রকৃতির সংযোগেই জগতের সৃষ্টি। আমিই এই জগতের মূল কারণ। প্রলয়ে উহা আমাতেই লয় হয়। এই প্রকৃতিই আমার গুণময়ী মায়া, ইহা একান্ত দুস্তরা। যাহারা আমার শরণাপন্ন হইয়া আমাকে ভজনা করে, তাহারাই কেবল এই দুস্তরা মায়া অতিক্রম করিতে পারে এবং মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করিয়া সদগতি লাভ করে। মদাশ্রিত ভক্তগণের ব্রহ্মতত্ত্ব অধ্যাত্মতত্ত্ব ও কর্মতত্ত্ব অধিগত হয়।

জরামরণমোক্ষায় মাগাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥
৭।২৯

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥
৭।৩০

—●—

## অষ্টম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে অর্জ্জুন উপরোক্ত তত্ত্বগুলি কি তাহা জানিতে চাহিলেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,— নির্গুণ অক্ষর ভাবই ব্রহ্মতত্ত্ব; নানা বিভূতিসম্পন্ন বিশ্বস্রষ্টারূপে আমার যে সগুণ স্বভাব তাহাই অধ্যাত্ম

তত্ত্ব; বিশ্বসৃষ্টির আদি কর্ম্মতত্ত্ব, আমার সৃষ্ট ভূতপ্রপঞ্চই অধিভূত, ভূতসমূহে অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে বর্ত্তমান পুরুষই অধিদৈবত, উহাই আমি।

সৃষ্টি রক্ষার্থ জীবের যাহা কর্ম তাহাই যজ্ঞ এবং আমি অধিযজ্ঞ-রূপে উহার নিয়ন্তা ও ফলভোক্তা। বস্তুত সকলই আমি। মৃত্যু-কালে আমাকে যে যে ভাবে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।

যিনি মৃত্যুকালে মনকে একাগ্র করিয়া যোগবলের দ্বারা প্রাণকে ভ্রূযুগলের মধ্যে ধারণ পূর্ব্বক পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনিই সদগতি লাভ করেন। আমাকে পাইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। (ভক্তি দ্বারাই সেই পরম পুরুষকে পাওয়া যায়।)

এই অধ্যায়ে দুইটি মার্গের কথা বলা হইয়াছে, দেবযান মার্গ এবং পিতৃযান মার্গ। মৃত্যুর পর জীবাত্মার কিভাবে সদগতি হয় তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে। সেই কথাই এখানে বলা হইয়াছে। ইহা ক্রমমুক্তির ব্যাপার। স্বগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ মৃত্যুর পর ক্রমে মুক্তি পান। যাঁহারা দেবতার পূজাপাঠ, যজ্ঞাদি দ্বারা পুণ্য অর্জ্জন করেন তাঁহারা পিতৃযান মার্গে গমন করিয়া স্বর্গলাভ করিয়া সুখ ভোগান্তে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু, সদ্যোমুক্তিভাক যোগিগণ জীবৎকালেই ব্রহ্মময় হন। তাঁহাদেব প্রাণ ব্রহ্মলীন হয়, উৎক্রান্ত হয় না।

—::—



## নবম অধ্যায়

সেই অক্ষর ব্রহ্ম কিরূপে ভক্তির বিষয় হইতে পারে, ইহাই এই অধ্যায়ের প্রশ্ন।

ভগবান্ বলিলেন,— ভক্তিযোগই সুখসাধ্য ও প্রত্যক্ষাবগম্য, ইহাই সর্ব্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বগুহ্যতম বিদ্যা।

ভগবান্ তাঁহার সগুণ ও নির্গুণ বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন, আমি অব্যক্ত মূর্ত্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া আছি। আমি নির্গুণ, নিঃসঙ্গ বলিয়া কিছুতেই লিপ্ত নহি, অথচ আমি প্রকৃতি দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করি, আমি সর্ব্বভূতে মহেশ্বর, আমি জীবের "গতি ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ"। অতএব তুমি আমাতে ভক্তিমান হও, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর।

ভগবান্ আনন্দময়। আনন্দঘন তাঁর স্বরূপ, আনন্দ আস্বাদন যে শক্তির মাধ্যমে হয় তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবান্।

ভগবান্ বলিলেন, আমার যে সকল ভক্ত অনন্য-মনে নিত্যযুক্ত হইয়া আমার ভজনা করে, তাহাদের যোগক্ষেম অর্থাৎ দেহাদি রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় যাহা কিছু সবই আমি নির্ব্বাহ ও রক্ষা করিয়া থাকি।

"কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতিঃ" ॥ ৯।৩১

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৮।১৬
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৯।৩৪

—*—

### দশম অধ্যায়

ভগবান্ বলিলেন, —যিনি জানেন যে আমার আদি নাই, জন্ম নাই, আমি সর্ব্বলোকের মহেশ্বর, মনুষ্য মধ্যে তিনি মোহশূন্য হইয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন।

প্রাণিগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমা হইতেই উৎপন্ন হয়। যিনি আমার এই বিভূতি এবং যোগৈশ্চর্য্য যথার্থরূপে জানেন, তিনি মৎভক্তিলক্ষণ-স্থিরযোগ লাভ করেন, অর্থাৎ তিনি অবিচলিত সম্যগ্‌দর্শন (তত্ত্বজ্ঞান স্থৈর্য) লাভ করেন।

অর্জ্জুন বলিলেন,— তোমার বিভূতি আমায় বিস্তারিতভাবে বল। শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সূর্য্য, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, বায়ুগণের মধ্যে মরিচী এইরূপ বহু বর্ণনা করিলেন। আরও বলিলেন, যাহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, যাহা শ্রীসম্পন্ন বা যাহা অতিশয় শক্তিসম্পন্ন, তাহাতেই আমার শক্তির সামান্য প্রকাশ জানিবে। আমি একাংশে এই জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি। (বাকী অংশগুলি প্রপঞ্চাতীত বিশ্বাতিগ, তাঁহার নির্গুণ স্বরূপ মনুষ্যের ধারণার অতীত।)

—::—

### একাদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন শ্রীভগবানের ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে চাহিলেন,—শ্রীভগবান্ তাঁহার নানাবর্ণ নানা আকৃতি-বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র বিভিন্ন অবয়ব বিশিষ্ট অদ্ভুতরূপ অর্জ্জুনকে দেখাইলেন। সাধারণ চক্ষে তাহা দেখা সম্ভব নয় বলিয়া তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দান করিলেন। অনির্ব্বচনীয়, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অত্যদ্ভুত সেইরূপ। তাহাতে সমবস্থিত চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিদৃশ্যমান, সেই বিশ্বমূর্ত্তির অসংখ্য উদর, বদন ও নয়ন, অসংখ্য অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তু তাহাতে বিদ্যমান। তাহা সর্ব্বতঃ পূর্ণ, সর্ব্বব্যাপি,— তাহার আদি নাই, অন্ত নাই। সহস্র সহস্র সূর্য্যের সম্মিলিত প্রভা অপেক্ষা তাহা উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের ব্যাপারে যাহা ঘটিবে তাহার দৃশ্যও দেখাইলেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,— বস্তুতঃ আমিই সকলকেই নিহত করিয়া রাখিয়াছি, তুমি নিমিত্তমাত্র হও। এই সকল উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া অর্জ্জুন ভীত হইলেন এবং শ্রীভগবান্‌কে পূর্ব্ব মূর্তি ধারণ করিতে বলিলেন। অনন্তর ভগবান্ তাঁহার স্বীয় রূপ প্রকাশ করিলেন।

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিত।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥" ১১৷৫৫

—*—

### দ্বাদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,— সতত ত্বদ্‌গতচিত্ত হইয়া যে সকল ভক্ত তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন উঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

শ্রীভগবান্ বলিলেন,— যাঁহারা আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরশ্রদ্ধ সহকারে আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাধক। যদি কেহ অভ্যাস-যোগ দ্বারা চিত্তকে স্থির করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সাধুসঙ্গ, ভাগবত শাস্ত্রাদি পাঠ, আমার লীলাকথা শ্রবণ, মদ্‌গুণ কীর্ত্তন ও পূজাদি করিবে। তাহাতেও সিদ্ধিলাভ হইবে। তাহাতেও অশক্ত হইলে আমাতে কর্ম্ম সমর্পণ যোগ আশ্রয় লইবে।

আমার ভক্ত কাহাকেও দ্বেষ হিংসা করেন না; তিনি সর্বদা মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু, ক্ষমাবান্, সমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কার বর্জ্জিত। তিনি শত্রু-মিত্র-মান-অপমান, হর্ষ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্ববর্জিত।

"যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥" ১২।২০

—*—

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকল জানিতে চাহিলেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ক্ষেত্র=দেহ, ক্ষেত্রজ্ঞ=জীবাত্মা। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই আমার (পরমেশ্বরের) জ্ঞান। (সাংখ্য মতে দেহ প্রকৃতি এবং আত্মা পুরুষ; প্রকৃতি ও পুরুষ দুইই মূল। গীতার মতে দুইই প্রকৃতি পরা ও অপরা, দুইই ভগবানের অংশ, ভগবানই মূল, তিনি পুরুষোত্তম।

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ মনের গুণ। প্রাণের ক্রিয়াই 'চেতন'। যে শক্তির দ্বারা মন ও চেতন স্থির থাকে তাহাকে 'ধৃতি' বলে।

দেহে যিনি ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থিত তিনিই পরমাত্মা। জগতের নানত্বের মধ্যে যিনি সেই এক ব্রহ্ম-সত্তাই উপলব্ধি করেন এবং সেই এক হইতে নানত্বের অভিব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করেন।

এই অবস্থাই সর্ব্বভূতাত্মৈক্য জ্ঞান দেহাত্মবিবেক, পুরুষ-প্রকৃতি বিবেক, ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সংসারক্ষয় ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হয়।



ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ ১৩।৩৪

("আমি বোধ" সম্বন্ধে পূর্ব্বে লিখিয়াছি। আমি আছি, আমার দেহ ইত্যাদি এই "আমি বোধ"। এই 'আমিই' সেই জীব বা জীবাত্মা।

চেতনা=জীবদেহে প্রাণের ক্রিয়া যাহা লক্ষিত হয় তাহাই চেতনা। সুষুপ্তি অবস্থায় চৈতন্য থাকে না, কিন্তু চেতন থাকে অর্থাৎ প্রাণের ক্রিয়া চলিতে থাকে। তপ্ত লৌহপিণ্ডে প্রকাশিত অগ্নির ন্যায় দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতে অভিব্যক্ত আত্মচৈতন্যের আভাস দ্বারা ব্যাপ্ত অন্তঃকরণ-বৃত্তিই চেতনা।)

—*—

## চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ভগবান্ বলিলেন,— দেব, মনুষ্যাদি বিভিন্ন যোনিতে যে সকল শরীর উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাহাদের মাতৃস্থানীয়া এবং আমিই গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা।

প্রকৃতির তিনগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম্ম, জ্ঞান ও সুখ, যাহার মনুষ্য ফলে বিষয়ে আবদ্ধ হয়।

রজঃ গুণের মুখ্য ধর্ম্ম, রাগাত্মক, ফল কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া দুঃখ ভোগ। তমঃ গুণের ধর্ম্ম, প্রমাদ, আলস্য নিদ্রাদি। এই তিন গুণই একত্র থাকে। যখন যেটা প্রবল হয় তখন তাহার ফল প্রকট হয়।

তিনের সাম্য অবস্থাই অব্যক্ত অবস্থা বা প্রলয়। গুণত্রয়ের বৈষম্যই সৃষ্টি। দেহে তিন গুণের কার্য্য চলিতে থাকে যিনি কোনও গুণের কার্যের উপর লক্ষই রাখেন না, উদাসীন ভাবে

থাকেন, সুখ-দুঃখে বিচলিত হয় না, যাঁর মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দা, শত্রু-মিত্র সমান, তিনিই ত্রিগুণাতীত।

মাঞ্চ যোঽব্যাভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬
ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য॥ ২৭

—●—

### পঞ্চদশ অধ্যায়

এই সংসারকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, যাহার মূল উর্দ্ধে এবং শাখাগুলি নীচের দিকে। পুরুষোত্তম হইতে সৃষ্টি বা পুরুষোত্তমই মূল, সেইজন্য বৃক্ষের মূল উর্দ্ধে বলা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন জীব আমারই সনাতন অংশ। উহা কর্ম্মফলে সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে। উহা দেহ ত্যাগ করিলে সূক্ষ্ম শরীর লইয়া স্থূলদেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় এবং স্বকর্ম্ম অনুযায়ী নূতন স্থূলদেহ ধারণ করে। এই সূক্ষ্ম শরীর লইয়াই পুনরায় বিষয় সমুহ ভোগ করিতে থাকে। জীবের এই জন্ম কর্ম্ম-তত্ত্ব। সর্ব্বভূত-প্রকৃতি-জড়িত জীবভাবই ক্ষরপুরুষ; কূটস্থ, নির্গুণ, ব্রহ্মতত্ত্বই অক্ষরপুরুষ। শ্রীভগবান্ এই দুই পুরুষ হইতে উত্তম; সেইজন্যই ইনি 'পুরুষোত্তম'।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমিই নির্গুণ, আমি সগুণ, আমিই বিশ্বরূপ, আমিই অবতার, আমিই আত্মা। এই পুরুষোত্তম তত্ত্ব অতিগুহ্য। ইহা জানিলে জীব কৃতকৃত্য হয়; সে আমাকে সর্ব্বতোভাবে ভজনা করে।



('চৈতন্য' ও 'চেতন' সম্বন্ধে পূর্ব্বে লিখিয়াছি। ষোড়শ অধ্যায় লিখিবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে আরও পরিষ্কার করিয়া লেখার প্রয়োজন মনে করিতেছি। বেদান্তের সার কথা লিখিবার সময় 'আমি বোধ' সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে। আমি আছি, আমার দেহ ইত্যাদি এই 'আমি বোধ' এই আমিই সেই জীব বা জীবাত্মা।

জীব দেহে প্রাণের ক্রিয়া যাহা লক্ষিত হয় তাহাই চেতনা। সুষুপ্তি অবস্থায় চৈতন্য থাকে না, কিন্তু চেতন থাকে অর্থাৎ প্রাণের ক্রিয়া চলিতে থাকে। শ্রুতির অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় চৈতন্য গীতার ক্ষরপুরুষ। আনন্দস্বরূপ গীতার পুরুষোত্তম ও বিজ্ঞানময় ভূমি অক্ষরপুরুষ। পরব্রহ্মের আনন্দময়তাই কিন্তু বেদের চরম দর্শন নহে।

"রসোহেবায়ং রসং লব্ধানন্দী ভবতি"
"রসো বৈ সঃ"
"ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ।
রসো ব্রহ্মরসং লব্ধা নন্দী ভবতি নান্যথা॥"

পঞ্চদশী

তিনিই রস-স্বরূপ। রস আস্বাদন করাই তাঁর আনন্দ। ইহাই শ্রুতির চরম ও পরম সংবাদ। এই আনন্দঘন রসরূপতাই পুরুষোত্তমের নিজস্ব স্বরূপ।) এই অধ্যায়ে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে যে, পুরুষোত্তম কূটস্থ অক্ষর হইতেও উত্তম। মায়াবাদে কূটস্থ অক্ষরই নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব।

—::—

### ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীভগবান বলিলেন,— নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান, নিষ্ঠা, কর্ম্মযোগ-তৎপরতা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম, শাস্ত্র-অধ্যয়ন, তপঃ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা-বর্জ্জন, জীবে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, কুকর্ম্মে-লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, হিংসা-না-করা, অনভিমান এই সকল (২৬টি) দৈবী সম্পদ্ অভিমুখে জাত পুরুষের হইয়া থাকে।

যাহারা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে দৈব-সম্পদ্ ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করে, তাহারা উপরোক্ত সত্ত্বগুণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। দৈবী-সম্পদ মোক্ষের হেতু।

যাহারা পূর্ব্ব জন্মের কর্মফলে আসুরী-সম্পদ ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করে, তাহারা দম্ভ, দর্প, অভিমান, কাম, ক্রোধ, লোভ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান এই রজঃ ও তমঃ গুণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। ইহাই বন্ধনের কারণ। মূঢ়মতি অসুর প্রকৃতির লোকগণ পুনঃ পুনঃ অসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করে।

এই অধ্যায়ে কয়েকটি শব্দ বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। কাজেই সেই শব্দগুলির অর্থ জানা বিশেষ দরকার :

জ্ঞান=আচার্য ও শাস্ত্র হইতে ব্রহ্ম ও আত্মাদি বস্তুর অবগতি।

যোগ=ইন্দ্রিয়াদি সংযম ও একাগ্রতা দ্বারা অবগত বস্তুর সাক্ষাৎকারের প্রচেষ্টা।

ব্যবস্থিতি=এই উভয়ে অবস্থিতি, নিষ্ঠা বা একাগ্রতা।

অভয়=শাস্ত্রোপদেশে সন্দেহরাহিত্য ও তদনুষ্ঠাননিষ্ঠতা—ভাগবতে আছে, তত্ত্ববিচারের দ্বারা ভবভয় দূর হয়।

দম্ভ=অধার্মিক হইয়া ও নিজের ধার্মিকত্ব জ্ঞাপন।



অভিমান=অপূজ্য হইয়াও নিজের পূজত্বের অভিমান।

মদযুক্ত=নিকৃষ্ট হইয়াও নিজেতে উৎকৃষ্টত্বের আরোপ ; সুতরাং মহতের অবজ্ঞা।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং যে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ১৬।২৪

—::—

### সপ্তদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পূজাদি করিয়া থাকে, তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ ?

শ্রীভগবান বলিলেন,—শ্রদ্ধা তিন প্রকার, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। মানুষ নিজ স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে।

সাত্ত্বিক স্বভাব ব্যক্তিগণ দেবগণের পূজা করে। রাজসিক লোকেরা যক্ষ-রক্ষদের পূজা করে এবং তামসিক প্রকৃতির লোকেরা ভূত-প্রেতের পূজা করে। শ্রদ্ধা স্বভাব অনুযায়ী হয়। মানুষ নিজের চেষ্টায় স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে। কাজেই শ্রদ্ধাও পরিবর্ত্তন করিতে পারে।

শ্রদ্ধা যেরূপ ত্রিবিধ, সেইরূপ আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ত্রিবিধ। প্রজা রক্ষার নিমিত্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রদ্ধাদির সহিত সম্পন্ন হইলেই উহা সৎ কর্ম্ম হয়।

(ঋগ্বেদে শ্রদ্ধাসাধন মন্ত্র আছে, তাহাতে শ্রদ্ধাকে ত্রিসন্ধ্যা আহ্বান করিয়া বলা হয়, 'হে শ্রদ্ধে, এখন আমাদিগকে শ্রদ্ধাময় কর।'

ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম ওমিতি ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, সদেব সোম্যেদম্।)

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ ১৭।২৮

—●—

### অষ্টাদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব কি, তাহা পৃথকভাবে জানিতে চাহিলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন, কাম্য কর্ম্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে এবং কর্মের ফল ত্যাগকেই ত্যাগ বলে। যজ্ঞ, দান, তপস্যারূপ কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে। স্বধর্ম বলিয়া যাহার যে কর্ম্ম আছে তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে। দুঃখকর বা কায়িক ক্লেশের ভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ রাজস-ত্যাগ, তাহা যথার্থ ত্যাগ নহে। ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। সে কর্ম্মে কোনও কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না। দেহ থাকিতে কর্ম্মত্যাগ সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নহে। (গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় গীতার সার বলিলেও চলে— ইহা পড়িয়া যাওয়া সহজ, কিন্তু বুঝা বা আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন। ইহা বুঝিবার জন্য আরও বহু প্রস্তুতির প্রয়োজন। আপাততঃ গীতা এখানেই থাক্, পরে সুবিধামত আবার আলোচনা করিব নানাভাবে।)

গীতার শ্লোক সংখ্যা সাত শত। শঙ্করাচার্য্য হইতে সকল ভাষ্যকারই এই সাতশত শ্লোকের গীতার ভাষ্য লিখিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের ৪৩ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে আছে, "গীতাতে কৃষ্ণ কথিত শ্লোক ৬২০, অর্জ্জুন কথিত শ্লোক ৫৭, সঞ্জয় কথিত ৬৭ এবং ধৃতরাষ্ট্র কথিত ১টি শ্লোক"। অর্থাৎ মোট ৭৪৫টি শ্লোক। কিন্তু প্রচলিত গীতায় পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণের ৫৭০টি, অর্জ্জুনের ৮৪টি, সঞ্জয়ের ৪টি এবং ধৃতরাষ্ট্রের ১টি।



কাথিয়াবাড়ের গণ্ডাল ষ্টেটের রসশালা ঔষধাশ্রম হইতে প্রকাশিত গীতায় ৭৪৫টি শ্লোক আছে। ভারতের অনেক স্থানে ৭৪৫টি শ্লোক যুক্ত গীতা প্রকাশিত হইয়াছে। কাশ্মীরি গীতার শ্লোকসংখ্যা ৭৪৫, কিন্তু উহা অনেক স্থলে প্রচলিত গীতা হইতে অন্যরূপ। মাদ্রাজের শুদ্ধ-ধর্ম্মমণ্ডল হইতে যে গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার শ্লোকসংখ্যা ৭৪৫। ইহাতেও অন্য অন্য শ্লোক ভরিয়া সংখ্যা ৭৪৫ করা হইয়াছে।

আকবর যে গীতার ফার্সী অনুবাদ করাইয়াছিলেন তাহার সংখ্যা ৭৪০।

গীতার আরবী তর্জমাও আছে। তাহার শ্লোকসংখ্যা ৭৪৫।

কয়েকটি বিশেষ শব্দের অর্থ দিলাম।

কৃষ্ণ :— কৃষ—উৎপত্তি বা সত্তা
ন—নিবৃতি বা আনন্দ, অর্থাৎ যিনি জন্মজন্মান্তর নিবারণ কর্ত্তা বা ভক্ত দুঃখ-বিনাশকারী।

গোবিন্দ :— গো—ইন্দ্রিয়। বন্দতি—পালন বা অধিষ্ঠান করা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের পরিপালক।

মাধব :—মা—শ্রী-লক্ষ্মী। ধব—পতি, অর্থাৎ শ্রীপতি।

ভগবান্ :—সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চেব যন্নাং ভগ ইতীরণাঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ—৬।৫।৭৪

উৎপত্তি প্রলয়ঞ্চৈব ভূতামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যাসবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥
বিষ্ণুপুরাণ—৬।৫।৭৮

ব্যাসদেব মহাভারত লিখিতে লিখিতে তাহার ভিতর কৃষ্ণ-অর্জ্জুন সংলাপ ভাবে গীতা লিখিলেন। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, শ্রীভগবানের শ্রীমুখ হইতে বাহির হইয়াছে, কাজেই যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য, তাহাতে সন্দেহের কোনও কারণ থাকিতেই পারে না। কারণ, ভগবানকে পাইবার পথ ভগবান্ যেরূপ জানেন তাহা অন্যের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ভগবানের সৃষ্ট জীব আমরা, কাজেই আমাদের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিবেন তাহাই ধ্রুব সত্য।

কিন্তু যদি ব্যাসদেব, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র বেদ-বেদান্ত ইত্যাদি আমাদের অবগতির জন্য, এই গীতার অর্জ্জুন-কৃষ্ণ সংলাপ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কথাগুলি ব্যাসদেবের, ভগবানের নয়; এবং তাহার কথাগুলি কতদূর গ্রহণযোগ্য তাহা বিচারের উপর নির্ভর করে, অন্যান্য শাস্ত্রের মত।

হিন্দু ধর্ম্মের নানা মত নানা পথ। যদি স্বয়ং ভগবান বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে নানা মতের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। গীতায় যে পথ দেখান হইয়াছে, তাহাই পথ।

ধর্ম্মরক্ষার জন্য ভগবান্ স্বয়ং কৃষ্ণরূপে আসিয়াছিলেন। তিনি নিজেই কংসকে বধ করিয়াছেন, নানা অসুর বধ করিয়াছেন, অতি অনায়াসে। এই কাজগুলি মানুষের কাজ বলিয়া মনে হইতে পারে না।



তাঁর সব কাজই মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। দুর্য্যোধনকে বধ করিবার জন্য অর্জ্জুনকে ঐরূপ খোসামুদি করিবার কি প্রয়োজন ছিল? যুদ্ধের কথা ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, যে কৌরবদের বধ করিতে পাণ্ডবদের অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল; এমন কি এক সময় শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন চক্রও ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। নানা অসদুপায়ও লইতে হইয়াছিল। দ্রোণকে বধ করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথা বলিতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যেই পাণ্ডবেরা কৌরবদের হারাইয়া ছিল। যদি শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের পূর্ব্ব হইতেই মারিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইলে এ যুদ্ধেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? ইহাতেই লোক-শিক্ষার কি আছে, যদি সকলেই বুঝিল, জানিল যে সবই শ্রীকৃষ্ণের কাজ। কাজেই মহাভারত যে একটা রসাত্মক বা ভাব সংবলিত রচনা তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তবে সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত নহে; তৎকালীন ঘটনার সহিত জড়িত। যাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা বাদ দিয়া যতটুকু রহিয়া যায়, তাহা হইতে পাওয়া যাইবে, তখনকার ইতিহাস, জাতি, ধর্ম্ম, সমাজের কথা, ভারতের কোন্ প্রান্তে কাহারা রাজত্ব করিত ও যুদ্ধ বিগ্রহ। শৌর্য্য-বীর্য্য, বিদ্যা, শিক্ষা, জ্ঞান, রাজনৈতিক নৈপুণ্যে তখনকার লোক কত উর্দ্ধে উঠিয়াছিল তাহাও পাওয়া যায়।

গীতা হইতে পাওয়া যায় সমগ্র হিন্দু-শাস্ত্রের নির্যাস ও সর্ব্ব ধর্ম্ম-সমন্বয়ের প্রয়াস। ধর্ম্মের মধ্য দিয়া মানুষকে কর্ম্মবীর করিবার জন্যও গীতার সৃষ্টি হইতে পারে।

গীতার আর একদিকও ভাবিবার কথা, গীতার গুরু উপদেষ্টা স্বয়ং ভগবান্ এবং শিষ্য শ্রোতা অর্জ্জুন। অর্জ্জুন রাজপুত্র, বিদ্বান্, শক্তিশালী, সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, শাস্ত্রজ্ঞ,

ইন্দ্রপুত্র, গুড়াকেশ, সেনাপতি, নরশ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের সখা। পৃথিবীতে তাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা ছিল না। তিনি সশরীরে স্বর্গে গিয়া দেবতাদের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। তিনি কামজয়ী, উর্বশীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এইরূপ নরশ্রেষ্ঠকে শ্রীভগবান্ স্বয়ং গীতা শুনাইলেন। দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত নানাভাবে বিচারের দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃত ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝাইলেন। তাহাতেও অর্জ্জুনের সন্দেহ রহিয়া গেল। তখন তাঁহাকে দিব্য দৃষ্টি দিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন, ভয়ও দেখাইলেন প্রকারান্তরে। তারপরও সন্দেহ রহিয়া গেল। আরও সাত অধ্যায় ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইলেন।

তারপর অর্জ্জুন বলিলেন, 'আমার মোহ নাশ হইয়াছে, এখন আপনার উপদেশ পালন করিব।' কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, তিনি গীতা ভুলিয়া গিয়াছেন এবং তাহা পুনরায় বলিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, গীতা আর বলা সম্ভব নহে, কারণ উহা তিনি যোগ অবস্থায় বলিয়াছিলেন।

ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ।
পরং হি-ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া॥
(মঃ ভাঃ অশ্বঃ ১৬শ অধ্যায়)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হইয়া নরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বগুণালংকৃত অর্জ্জুনকে গীতার মর্ম্ম বুঝাইতে নানা কৌশল প্রয়োগ করিয়া হিম্-সিম্ খাইয়া গিয়াছিলেন। সব কথা বলা শেষ হইয়া গেলেও শ্রীকৃষ্ণের মনে সন্দেহ রহিয়া গিয়াছিল, সেইজন্য অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥"



কাজেই সেই গীতা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা অসম্ভব কথা। গীতা পড়িয়া বা অন্যের কাছে শুনিয়া ইহার মর্ম্ম আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। গীতা যদি সহজবোধ্য হইত তাহা হইলে নানা প্রকার ভাষ্যের প্রয়োজন হইত না। ভাষ্যকারেরা নিজ নিজ মত নিজ নিজ ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। গীতা পড়িতে পারেন, অর্থ বুঝিতে পারেন, কিন্তু গীতা পাঠ করিয়া মোহনাশ সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে। নিষ্কাম কর্ম দেহ থাকিতে সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণের চরণে সব কিছু সমর্পণ তাহাও সম্ভব নহে। অত্যন্ত দুরঃধিগম্যা বলিয়াই গীতা সম্বন্ধে বলা হয়,— 'কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্' বা 'ব্যাসোবেত্তি ন বেত্তি বা' ইত্যাদি।

গোপিনীদের প্রেমের কাহিনী এক ভাগবতে আছে। বাকী যাহা পাওয়া যায় সবই কবির কল্পনা। তাহার প্রমাণ কিছুই নাই। যে প্রেম গোপিনীরা দেখাইয়াছেন, তাহা দেখাইয়াছেন কিয়দংশে একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ। মানুষের পক্ষে কি সেই মহাপ্রেম সম্ভব? যে প্রেমের কথা রাসপঞ্চাধ্যায়ে আছে, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ভগবান আর গোপিনীরা ছিলেন দেবতাদেরও অনেক উর্দ্ধে। উহাকে মানবলীলা বলিলে ভুল হইবে।

নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যেরূপ শ্রীভগবানের কৃপায় গীতার মর্ম্ম বুঝিয়া মোহশূন্য হইয়াছিলেন, আমাদেরও সেইরূপ সদ্গুরুরূপী শ্রীভগবানের কৃপা ছাড়া মোহশূন্য হওয়ার আর কোনও উপায় নাই। গীতা পড়া, পড়া মাত্র। তবে একথা সত্য যে, ব্যাসদেব যদি গীতা না লিখিতেন, তাহা হইলে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম অনেক পূর্ব্বেই লোপ পাইত। গীতা মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ করিয়া পণ্ডিত হওয়া যায়, কিন্তু মোহনাশ হয় না। মোহনাশের পদ্ধতি, শ্রীভগবানের কৃপা

হইলে, সদগুরুর চরণে আশ্রয় লইলে একমাত্র সদগুরুই শিখাইতে পারেন।

(গীতা লেখা শেষ হইল, কিন্তু অন্য বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে দৈব, অদৃষ্ট, সন্ন্যাস ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু লেখা প্রয়োজন মনে করিতেছি। কোনও কর্ম্ম করিতে গেলে কি কি প্রয়োজন? কর্ত্তা, যে করে; যাহার দ্বারা করান হয় সে 'করণ' বা ইন্দ্রিয়গণ। দেহ অধিষ্ঠান এবং প্রাণাপানাদি চেষ্টার ব্যাপার, এবং সর্ব্বশেষ আমাদের অজানা একটি বিষয় আছে যাহাকে দৈব বলা হয়।

ভাগবতে আছে, "সর্ব্বে বহামো বলিমীশ্বরায় প্রোতা নমীব দ্বিপদে চতুষ্পদঃ" আবার পাওয়া যায়।

"ললাটে লিখিতং যত্তু ষষ্ঠিজাগর বাসরে।
ন হরিঃ শঙ্করোব্রহ্মা চান্যথা কর্ত্তুমর্হতি॥"

ইহা অদৃষ্টবাদের কথা। কিন্তু আমরা যাহা কিছু ফল পাই, সবই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। পূর্ব্বজন্মে পুরুষকার দ্বারা যে সকল কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার ফল এই জন্মে পাইতেছি। তাহাই 'অদৃষ্ট'। কারণ পূর্ব্বজন্মের ব্যাপার জানার উপায় নাই। পুরুষকার আমাদের মধ্যে আছে। "পৌরুষং ধৃষু।" কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেই হইবে; তাহাতে অদৃষ্টের কোনও প্রশ্নই আসে না। ফল দৈবের হাতে। কাজেই ফলের চিন্তা না করিয়াই কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে।

## 'সন্ন্যাস'

বিবেক বিচার পূর্ব্বক বৈরাগ্যোদয় না হইলে মুক্তির আশা নাই। অর্থাৎ ইহকাল পরকালের অনিত্যতা বিচার পূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই সত্য এই নিশ্চয়তা সহ যে বৈরাগ্যের ভাব উদিত হয়,



তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। যতদিন দেহাত্মবোধ আছে ততদিন ঐরূপ বৈরাগ্য ভাব উদিত হইতে পারে না।

সাত্ত্বিক জ্ঞান দৃঢ়ীকৃত না হইলে, কেবল কর্ম্মসন্ন্যাস দ্বারা প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ হয় না। উপরোক্ত কারণ ব্যতীত অন্য কোনও কারণে সন্ন্যাস গ্রহণ বৃথা, তাহা 'সন্ন্যাস' নহে। ইচ্ছা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ হয় না। অত্যধিক সত্ত্বগুণ প্রভাবে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যখন পরমেশ্বর ছাড়া সবই ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সেই অবস্থাই 'সন্ন্যাস'।

অভ্যাস দ্বারা স্বভাবকে শুদ্ধ করিতে হইবে, নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা স্বধর্ম্ম পালন করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করিতে হইবে। তাহার পর বিবেক বিচার দ্বারা ইহকাল পরকালের অনিত্যতা দৃঢ়ীকৃত হইলে বৈরাগ্য-ভাব আপনা হইতেই উদিত হয়। বহু জন্মের নিষ্কাম কর্ম্মের ফলে বৈরাগ্য ভাব আসে ও মানুষ সন্ন্যাসী হয়। সন্ন্যাস ধর্ম্মের উল্লেখ বেদেও পাওয়া যায় মুনি ঋষিদের প্রসঙ্গে।

তপস্যা বা সন্ন্যাস ধর্ম্ম কত পুরাতন তাহা ঠিক বলা যায় না। ঋগ্বেদে আছে,—

"দেবা এতস্যামবদন্ত পূর্ব্বে সপ্ত ঋষয়স্তপসে যে নিষেদুঃ।
ভীমা জায়া ব্রহ্মণস্যোপনীতা দুর্ধাং দধাতি পরমে ব্যোমন্॥"

ঋঃ ১০।১১৯।৪

আবার আছে,—

মুনয়ো বাতরশনাঃ পিশঙ্গা বসতে মলা।
বাতস্যানুধ্রাজিম্ যন্তি যদ্ দেবাসো অবক্ষিত॥
উন্মদিতা মৌনেয়েন বাতা আ তস্থিমা বয়ম্।
শরীরেদস্মাকং যূয়ং মর্ত্তসো অভিপশ্যথ॥

ঋঃ ১০।১৩৬।২+৩

ইহা হইতে শুধু মুনি ঋষিদের কথা যে পাওয়া যায় তাহা নহে, তাহাদের হলুদ রঙের ময়লা কাপড়, কঠোর দৈহিক ও মানসিক ক্লেশের কথা পাওয়া যায়।

ইহার পূর্ব্বের শ্লোকেই আছে,— "কেশ্যাগ্নিং কেশী" ইত্যাদি। তাহাতে পাওয়া যায় তাঁহারা দীর্ঘকেশ যুক্ত ছিলেন।

সন্ন্যাস ধর্ম্ম সাধনের কালাকাল নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, যখনই বৈরাগ্যের উদয় হইবে, তখনই প্রব্রজ্যা করিবে। জীবনের অনিত্যতাবশতঃ যুবাকালেই ধর্ম্মশীল হইবে। শাস্ত্রের চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাসের বিধান দেখিতে পাওয়া যায় ;—(১) বিদ্বৎ সন্ন্যাস, যথা,—হঠাৎ ঠিক্ ঠিক্ বৈরাগ্য হইল ও তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাস লইয়া বাহির হইয়া পড়া ;—ইহা প্রাক্‌জন্ম সংসার না থাকিলে হয় না। (২) বিবিদিষা সন্ন্যাস, যথা,—আত্মতত্ত্ব জানিবার প্রবল বাসনা হইতে শাস্ত্রপাঠ ও সাধনাদি দ্বারা স্ব স্বরূপ অবগত হইবার জন্য, কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিকট সন্ন্যাস লইয়া স্বাধ্যায় ও সাধন ভজন করা। (৩) কর্কট সন্ন্যাস, যথা,—সংসারের তাড়নায় স্বজন বিয়োগ বা অন্য কোন কারণে, কেহ কেহ সন্ন্যাস লইয়া বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা বেশী দিন প্রায়ই স্থায়ী হয় না। (৪) আতুর সন্ন্যাস, যথা,— মুমূর্ষু রোগ শয্যায় শায়িত, বাঁচিবার আশা নাই, তখন তাহাকে বিধিমত সন্ন্যাস দেওয়া হইল। ইহাও শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস। তাহার যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পবিত্র সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের পর মৃত্যু হইল, পর জন্মে এই পুণ্য ফলে ভাল জন্ম পাইবে। আর যদি বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে আর গৃহে না গিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী হইয়া কাল যাপন করা।



## ব্রহ্ম বিচার

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হইলে কোনও শক্তি বা সত্ত্বার অস্তিত্ব স্বীকার করা কঠিন। কিন্তু যে শক্তি বা সত্ত্বা অতি সূক্ষ্ম তাহা বিচার ও তাহাদের স্থূল ক্রিয়ার দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি।

মন ও শরীর যখন অচেতন হয়, তখন তাহাদের দ্বারা কোনও কর্ম্মই সম্ভব হয় না। শরীর ও মন যতক্ষণ চেতন যুক্ত থাকে ততক্ষণই কর্ম্ম করে। দেহের ও মনের চৈতন্য শক্তি অতি সূক্ষ্ম ; ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তথাপি ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।

দ্বিতীয় শক্তি উপাদান শক্তি, যে শক্তির দ্বারা নানা উপাদান, নানা আকারে নানাভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ বা জাগতিক সব কিছুরই সৃষ্টি হইতেছে। উপাদান শক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, অথচ তাহার ক্রিয়া দেখিয়াই আমরা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করি।

ইহাও দেখিতেছি যে উপাদান শক্তির দ্বারা যাহা স্থূল ও সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিতেছে,— তাহা চৈতন্য শক্তির অভাবে নিষ্ক্রিয়। কাজেই এই দুই শক্তির মিলনেই কর্ম্ম সম্ভব হয়।

যখন এই দুই শক্তি স্বীকার করিতেছি, এখন ভাবিতে হইবে এই দুই শক্তি কোথা হইতে আসিতেছে? ইহাদের উৎপত্তি কোথায়? ইহাদের সত্ত্বা কোথায়? ইহাদের আশ্রয় কোথায়? সত্ত্বার আশ্রয় ব্যতীত শক্তির স্বতন্ত্র অবস্থা সম্ভব নহে। শক্তির কথা উঠিলেই প্রশ্ন উঠিবে, কাহার শক্তি? শক্তিগুলি যে সত্ত্বার আশ্রিত তাহারই অধীন।

আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ যে রূপ গ্রহণ করে তাহা উপাদান শক্তিরই স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রকাশ। চৈতন্য শক্তির সহিত মিলিত

হইয়া ইহারা নানা কর্ম্ম করে। এই কর্ম্ম দেখিয়াই আমরা বিশ্বাস করি সূক্ষ্মদেহ ও চৈতন্যের অস্তিত্ব।

কিন্তু যে সত্ত্বার উপর এই দুই শক্তি আশ্রিত বলিতেছি, সেই সত্ত্বার অস্তিত্ব বিশ্বাস করিব কি করিয়া ?

মানুষের কথা ধরা যাক্। আমরা নিজের ইচ্ছামত মন ও প্রাণের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। তারপর যখন স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায় মগ্ন হই, তখন আমাদের কোনও চেতনই থাকে না। তখন আমাদের চৈতন্য শক্তি কোথায় যায়? গভীর নিদ্রার সময় যদিও 'চেতনা' থাকে না, তথাপি আমাদের দেহের ভিতরের সব ক্রিয়াই চলিতে থাকে, যথা-শ্বাস-প্রশ্বাস, পাকস্থলীর কর্ম্ম, রক্ত চলাচল ইত্যাদি দেহের আভ্যন্তরীণ সমুদয় কাজ-কর্ম্ম ঠিক চলিতে থাকে। তাহার সহিত আমাদের চৈতন্যের কোনও সম্পর্ক নাই বলিয়া মনে হয়।

কাজেই আমরা দেখিতেছি যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ও চৈতন্য ছাড়া এমন এক সত্ত্বা এই দেহের মধ্যে আছে, যাহার অস্তিত্বের জন্য আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস এবং দেহের যাবতীয় আভন্তরীণ ক্রিয়া চলিতেছে এবং যাহার ইচ্ছায় আমাদের মন, প্রাণ, চৈতন্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সেই সত্ত্বাই উপরোক্ত দুই শক্তির আশ্রয় স্থল এবং আমাদের 'আমি বোধ'। তাহাই আমাদের 'আত্মা'। 'আমি বোধ'ই এই দুই শক্তির আশ্রয়স্থল। এই 'আমি বোধ'ই আমার প্রকৃত আত্মসত্ত্বা। এইরূপ বিশ্বের প্রতি বস্তুরই আত্মসত্ত্বা সেই একই 'আমি বোধ'।



'নাহং মনুষ্যো ন চ দেব যক্ষো
ন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী গৃহী-বনোস্থো
ভিক্ষুর্ণচাহং নিজবোধরূপ, ॥

শঙ্কর।

স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ সমগ্র বিশ্বের অন্তরে অন্তরে সেই একই 'আমি বোধ' রূপ আত্মসত্ত্বা বিরাজ করিতেছেন ; তিনিই বিশ্বাত্মা বা ব্রহ্ম। বিশ্বাত্মা ব্রহ্মের 'আমি বোধ'ই বিশ্বের অন্তর্গত চরাচর সমস্ত পদার্থের সকল রকম উপাদান সামগ্রী, ব্রহ্মের রূপগ্রহণ উপাদান শক্তি হইতে, ব্রহ্মের চৈতন্য শক্তির মিলনে প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই দুই শক্তি তাঁহারই অন্তর্গত।

বিশ্বাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান, কারণ এই ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই। যাহা কিছু দৃশ্য অদৃশ্য জগৎ সবই এই ব্রহ্মের উপরোক্ত দুই শক্তির দ্বারা ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্ট হয় আবার ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায়।

যে সৃষ্টিতে চৈতন্য সক্রিয় সেই সৃষ্টিই সজীব যথা মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সচল-জীব-জগৎ বা বৃক্ষাদি অচল-জীব-জগৎ ; জড়-জগৎ যথা, প্রস্তর, ভূমি ইত্যাদি ব্রহ্মের উপাদান শক্তির স্থূলরূপ মাত্র। সেখানে চৈতন্যের সম্পুর্ণ অভাব। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একই ব্রহ্মের বিভিন্নরূপ।

এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, উপরে যে 'আমি বোধ' বলা হইয়াছে, তাহা 'অহঙ্কার' নহে। অহঙ্কার আমাদের একপ্রকার মানসিক খণ্ডিত ভাব। ইহা 'আমি বোধ' হইতে জাগ্রত হইয়া কিছু কর্ম্ম করাইয়া লয়। বিভিন্ন কর্ম্মের জন্য বিভিন্ন অহঙ্কারের

প্রয়োজন হয়। 'আমি বোধ' হইতেই অহঙ্কারের উৎপত্তি এবং 'আমি বোধেই' উহার লয় হয়।

—::—

## অনন্ত ব্রহ্ম

ব্রহ্ম অনন্ত তার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। তাই ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু থাকার প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ পাইয়াছেন যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের সৌর জগতের ন্যায় অসংখ্য সৌরজগৎ আছে।

অতএব আমাদের সৌরজগতের পারে আরও অনেক সৌরজগৎ আছে। প্রশ্ন উঠিবে ঐ সকল সৌরজগতের পারে কি আছে? যদি বলি তারপর আরও অসংখ্য সৌরজগৎ আছে বা তাহার পূর্ব্বাবস্থা 'নিবিউলি' আছে। এক 'নিবিউলি' হইতে অসংখ্য সৌরজগৎ। অসংখ্য 'নিবিউলি' এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রবল বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই সকল নিবিউলিগুলির পারে যদি বলি আর কিছু নাই, তাহা হইলে সব শেষে কি কিছু বেড়া বা দেওয়াল জাতীয় কোনও কিছু আছে? অথবা যদি বলি, ইহাই শেষ সীমা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের, তখন প্রশ্ন উঠিবে, সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অপর পারে কি আছে? যদি বলি কোনও জমাট পদার্থ দিয়া ওপার বন্ধ আছে। তখন প্রশ্ন উঠিবে ঐ জমাট পদার্থটি প্রস্থে কতখানি? তখন আবার প্রশ্ন উঠিবে, উহার ওপারে কি আছে? এইরূপে প্রশ্ন বা বিচারের দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি যে আকাশ বা শূন্য অনন্ত। কারণ যদি আমরা বলি আকাশ বা শূন্য মাত্র ১০০ কোটি মাইল, তখন প্রশ্ন হইবে, সেই ১০০ কোটি মাইলের পর কি আছে। কাজেই এই আকাশ বা শূন্য সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। এই অনন্ত



আকাশে রহিয়াছে, দৃশ্য, অদৃশ্য, স্থূল, সূক্ষ্ম, জানা, অজানা, চেতনযুক্ত, চেতনহীন, উষ্ণ, উষ্ণতম, শীতল, শীতলতম নানাপ্রকার নানা ঢঙ্গের পদার্থ বা বস্তু। এই অনন্ত আকাশেই তাহাদের জন্ম, এই অনন্ত আকাশেই তাহাদের মৃত্যু। এই অনন্ত আকাশেই রহিয়াছে চৈতন্যশক্তি, এই অনন্ত আকাশেই রহিয়াছে রূপ গ্রহণের উপাদান শক্তি। সব কিছুই অনন্ত আকাশের। এই অনন্ত চিন্ময় আকাশই সব কিছুই হইয়া আছেন, তিনিই অনন্ত ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম। ওঁ তৎ সৎ।

—*—

## ত্রিগুণ

ত্রিগুণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কয়েকবার বলা হইয়াছে। আবার কিছু লিখিতেছি :— এই গুণ বলিতে কি বুঝায়? সাধারণতঃ 'গুণ' বলিতে দ্রব্যের গুণ, মানুষের গুণ ইত্যাদি শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি গুণ বুঝি। কিন্তু ত্রিগুণ বলিতে তাহা বুঝায় না। এখানে 'গুণ' বলিতে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল রূপ গ্রহণের উপযোগী উপাদানকে বুঝাইবে। এই ত্রিগুণের কাজ দেখি আমরা সংসারে, সৃষ্টিতে। ঐ তিনগুণ দ্বারা প্রকৃতি জীবদেহে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

ত্রিগুণের কর্ম্মকে ভাব বা সমাহার ত্রৈগুণ্য বলে। গীতায় ১৪।৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতিজাত, এই গুণত্রয় দেহ মধ্যে অব্যয় আত্মাকে বন্ধন করিয়া রাখে।

—*—

## ধ্রুবনীতি

শাশ্বতনীতি—বেদের ভাষায় 'ঋতম্' পুরাণকার ইহাকে মোক্ষ বলিয়াছেন। ধ্রুবনীতি জীবনে পরিব্যক্ত হয় আত্মা ও পরমাত্মার

নিবিড় সম্বন্ধানুভূতিতে। ধ্রুবনীতি প্রকৃতি মধ্যে অভিব্যক্ত হয় অংশ ও পূর্ণের ঘনিষ্ঠ ঐকাত্ম্য সম্বন্ধে।

—*—

## ব্রহ্মাভ্যাস

"তৎ কথনং তম্মননমন্যোহন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ॥

পঞ্চদশী

## উপদেশ (মহাভারত হইতে লওয়া)

শত্রোরপিগুণা বাচ্যা দোষ বাচ্যা গুরুরোপি।
সর্ব্বথা সর্ব্বযত্নেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ॥

শত্রুরও গুণ বলা উচিত; গুরুর দোষও বলা উচিত। সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বপ্রযত্নে পুত্র ও শিষ্যকে হিতবাক্য বলা উচিত। উদ্যোগ পর্ব্বে যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন, 'আপৎকালে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়; বিদ্বান লোক বুদ্ধিবলে কর্ত্তব্য নির্ণয় করে।

শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে বলিয়াছিলেন, 'দৈব অনুকুল না হইলে কেবল পুরুষকারে কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। শত্রুকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। যাহার হিতাহিত জ্ঞান নাই, তাহাকে কিছু বলা, বধিরের নিকট গান গাওয়ার সমান।

অতিশয় নির্বন্ধ (জিদ) দুঃখের কারণ হয়। (গালবের উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।)

## পঞ্চযজ্ঞ

গৃহস্থের করণীয় কর্ম্ম পাঁচ ভাগে বিভক্ত:—

(১) ব্রহ্মযজ্ঞ=ঈশ্বর চিন্তা; বেদ; উপনিষদ্ ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ পাঠে ঈশ্বর সম্বন্ধে অবগত হইয়া, সেই অনুসারে চলা।



(২) নৃযজ্ঞ=মানুষের সেবা করা, বা নানাভাবে মানুষের উপকার করা।

(৩) দৈবযজ্ঞ=দেব-দেবীর পূজা।

(৪) পিতৃযজ্ঞ=পিতা, পিতামহ আদি উর্দ্ধতন পুরুষগণ ও মাতা মাতামহাদিগণের তর্পণ ও তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি করা।

(৫) ভূতযজ্ঞ=মনুষ্য ছাড়া অন্যান্য জীবের সেবা করা, যথা— গোসেবা ইত্যাদি।

## ঈশ্বর উপাসনা

মানুষ নিজের স্বার্থে কিংবা দশ জনের দেখিয়া শুনিয়া ঈশ্বর উপাসনা করে। আর এক শ্রেণীর মানুষ ঈশ্বর উপাসনা করে, স্বভাবতই, সংস্কার বশতঃ। পূর্ব্ব জন্মে ঈশ্বর উপাসনা করিয়া আসিয়াছে, কাজেই এ জন্মেও তাহাই করিতেছে, আরও সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে।

মানুষ যখন দেখে যে অন্যে ঈশ্বর উপাসনা করিয়া শান্তিতে আছে, তখন সেও ঈশ্বর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। আবার মানুষ নানা দুঃখের মধ্যে যখন সম্পূর্ণ অসহায় হয়, অন্য পথ আর খুঁজিয়া পায় না তখনই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়।

ঈশ্বর উপাসনার সঠিক পদ্ধতি জানার জন্য কোনও সংগুরুর আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজন হয়। তাহাই গুরুকরণ। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইলে, গুরু মন্ত্র দান করেন। সেই মন্ত্র জপ করিতে করিতে মনঃস্থির হইলে ঈশ্বর উপাসনায় সুবিধা হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, জপযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। জপ অভ্যাস হইলে ধ্যান হইবে, ধ্যান অভ্যাস হইলে ধারণাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। তন্ত্রে গুরুকরণের বিষয় বিশদ্‌ভাবে দেওয়া আছে।

## দর্শন

কয়েকটি দর্শনের কথা বলিব পরের পর যাহাতে সেগুলি বুঝিবার সুবিধা হয় :—

সাংখ্য দর্শন—ইহা পূর্ব্বেও সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। ২৪ তত্ত্বকে প্রকৃতি বলে ; ইহারা জড়। আর একটি তত্ত্ব আছে, তাহা পুরুষ, ইহা চিৎবস্তু। পুরুষ নির্লিপ্ত, উদাসীন, সাক্ষী, দ্রষ্টা। মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক। ইহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। এই মতে প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য পদার্থ ও পরস্পর সাপেক্ষ। পুরুষের সংযোগে সংসারের ব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। প্রকৃতিই আদিকারণ হইতে ক্রমশঃ কার্য পরম্পরায় সব কিছুই উৎপত্তি হয়। সমস্ত বিশ্ব ব্যাপারই প্রকৃতির কার্য। পুরুষই প্রাণীদের আত্মাস্বরূপ। এই দর্শনে বস্তু মাত্রই সৎ ; সৎ হইতেই সতের উৎপত্তি। মহর্ষি কপিল মাতাকে সাংখ্যতত্ত্ব, পুরুষ-প্রকৃতি ভেদ, অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগ, কলা, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি শিক্ষা দেন। একাগ্রচিত্তে তপস্যার জন্য কপিল পৃথিবীর নিম্নভাগে পাতালে আশ্রম স্থাপন করেন।

ন্যায় দর্শন :—ইহাতে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি ১৬টি বিষয়ের উল্লেখ আছে। সেইগুলি সম্পূর্ণ বোধগম্য হইলে এবং সেই জ্ঞান উপযোগী জীবন যাপন করিলে মোক্ষদ্বারে যাওয়া যায়। আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ১২টি প্রমেয় বলে। প্রমেয়গুলির ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয় আত্মা। গোতম এই দর্শন শাস্ত্রের প্রবর্তক। এই দর্শন তর্কশাস্ত্র, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, যুক্তির দৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত।



পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন :—মহর্ষি জৈমিনী প্রণীত। ইহাতে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সার আছে। ইহার মতে কর্ম্ম তিন প্রকার, (১) মন্দকর্ম্ম বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম, (২) সৎ কর্ম্ম বা সকাম কর্ম্ম ও (৩) নিষ্কাম কর্ম্ম বা ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত কর্ম্ম। নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল নরকভোগ, দুঃখ ভোগ। সৎকর্ম্মের ফল স্বর্গাদি সুখ ভোগ এবং নিষ্কাম কর্ম্মের ফল মোক্ষলাভ। গীতায় এই মতবাদীদের 'বেদবাদরতঃ' বলা হইয়াছে (গীঃ ২।৪২) ষড়দর্শনের মধ্যে মীমাংসা দর্শন কর্ম্মবাদী। মীমাংসা মতে যজ্ঞাদিই ধর্ম্ম এবং স্বর্গই পরম পুরুষার্থ। তদ্ভিন্ন ঈশ্বর তত্ত্ব বা ব্রহ্ম বলিয়া কিছুই নাই।

পাতঞ্জল দর্শন :—যোগের সাহায্যে আত্মার মুক্তি কিরূপে ঘটে তাহার বিবরণ আছে। জীবাত্মা যখন চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া বা প্রবৃত্তির বিনাশ করিয়া, পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়, সেই অবস্থায় মানবত্বে ও ঈশ্বরের সংযোগ হয়। মনকে সকল চিত্তবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া পরমেশ্বরের বিষয় ধ্যান করাকে যোগ বলে। যোগের আটটি অঙ্গ আছে ; যথা, (১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান এবং সমস্ত পুণ্যফলদায়ক সমাধি অষ্টম। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া সপ্তম অবস্থায় বুদ্ধি আত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায়। সেই সময় চিত্তবিমুক্তি ঘটে, আত্মার মোচন হয়। এই মতেও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয়। জীব স্বভাবতই চিন্ময়মাত্র। অজ্ঞানহেতু সংসারে প্রবৃত্ত থাকা হেতু 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' ইত্যাদি বোধ হইতে থাকে। তত্ত্বজ্ঞান হইলে অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং সেই চিন্ময় স্বরূপই বিদ্যমান থাকে। ইহাকে কৈবল্য বা মুক্তি বলে। পাতঞ্জল দর্শনের

সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ এই চারি খণ্ডেই আত্মার কথা আছে।

বেদান্ত দর্শন :—জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ব্রহ্ম দৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূলীভূত কারণ। বেদান্তের ব্রহ্ম, ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। বেদান্তের মায়ার শক্তি সর্ব্বত্র, মায়াই দুঃখের কারণ। ব্রহ্মের শক্তি মায়া। মায়ায় মিথ্যাকে সত্য দেখায়, যথা—রজ্জুতে সর্পভ্রম করায়। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা অজ্ঞান বা ভ্রান্তি দূর হয়। মায়াকে মায়া বলিয়া জ্ঞান হইলেই মায়ার কার্য আর থাকে না। জীব তখন নিজ আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারে।

তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে পরংদৃষ্টা নিবর্ত্ততে।

## বৈশেষিক দর্শন বা ঔলুক দর্শন

মুনি উলুক বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা। ইহার অপর নাম ঔলুক দর্শন। মুনি উলুক তণ্ডুল কণা খাইয়া জীবনধারণ করিতেন বলিয়া তিনি কণাদ নামে পরিচিত। ইনিই সর্ব্বপ্রথম পরমাণু-বাদী। ইহার মতে জীবনে কঠোরতাই ঋষিদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলসূত্র। মহর্ষি কণাদ 'বিশেষ' নামে এক অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার দর্শনের নাম বৈশেষিক। কণাদের মতে ছয়টি ভাব পদার্থ ও একটি অভাব পদার্থ। মোট সাতটি।

ভাব পদার্থ যথা, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। অভাবের চার ভাগ, যথা, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব। কণাদ বলেন, একমাত্র পরমাণু সৎস্বরূপ নিত্য-পদার্থ, তাহার আর কারণ নাই। সমস্ত জড় পদার্থই পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হইতেছে, বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে 'বিশেষ' নামে একটি পদার্থ আছে, তাহারই শক্তিতে বিভিন্ন রূপ পরমাণু ভিন্ন বলে প্রতীতি হয়। তিনি প্রথমে দেখান তেজ ও আলোক—একই মূল পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা। কণাদ দর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় না। দ্রব্য বলিতে নয়টি বুঝায়, যথা— ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম, কাল, দিক্, মন ও আত্মা। এই আত্মাই অক্ষয় জীবাত্মা।



লুপ্তযোগ :— আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।

—::—

## হিন্দুশাস্ত্র ও অধুনা সমাজ

যে যুগে হিন্দু শাস্ত্রাদি রচনা করা হইয়াছে, সে যুগের সহিত অধুনা যে যুগ চলিতেছে, তাহার কোনই মিল নাই। সমাজের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাই। ব্রাহ্মণেরা যদিও তাঁহাদের বৈদিক ব্রাহ্মণত্ব সবই হারাইয়াছেন, তথাপি পূজা পদ্ধতিতে এখনও অগ্রস্থান পাইয়া থাকেন। মুনি ঋষি বহুযুগ পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়াছে। এখন আর কথায় কথায় শাপ দেওয়ার ভয় নাই। পুরাণের গল্পগুলি ঈশপের গল্পের মতই মনে হয়। সংগুরু নাই বলিলেই হয়। দেশ অসাধু ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। বেশীর ভাগ ধর্ম্ম সংস্থানই ব্যবসয়িক ভিত্তিতে চলিতেছে। শ্রীশ্রীবদ্রীনাথ হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত প্রতিটি ধর্ম্মক্ষেত্র দেখিয়া আসুন, দেখিবেন ধর্ম্মের নামে কি প্রকার ব্যবসা চলিতেছে। লোকের

এত দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য, তথাপি সাধারণ লোক ধর্ম্মভীরু ও ধর্ম্মকথা শুনিতে চায়, দেব-দেবীর প্রতি ভক্তিও আছে।

—●—

## সৎপথ

সৎপথে চলিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক। এই সকল গুণের মধ্যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেম প্রধান। শ্রদ্ধা সকলের মুল স্বরূপ। শ্রদ্ধা বলিতে বুঝায়, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস, প্রত্যয় ও নিষ্ঠা। এইজন্য অধ্যাত্ম মার্গে প্রবেশ করিতে হইলে ইহার প্রথম সাহায্য লইতে হয়। বিশ্বাস করা কঠিন। ভগবানের কৃপা ও নিজের সুকৃতি ছাড়া বিশ্বাস জন্মে না। বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তির যোগ থাকিলে হৃদয়ে আরও উচ্চভাব প্রকাশিত হয়, আবার বিশ্বাস না থাকিলে ভক্তিও হয় না। ভগবানের অভাবে জীবন অসহ্য বোধ হওয়া চাই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর পূর্ণ নির্ভর থাকা চাই— ইহার নাম ভক্তি। ভক্তির উদয়ের পর হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়। ভক্তি ও বৈরাগ্যের সহিত প্রেম প্রবল হইলে চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু ঝরিতে থাকে। মন শান্ত হয়।

—●—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

"ব্রহ্মা মুরারী স্ত্রীপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতোবুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহু কেতু কুর্ব্বন্ত সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥
প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥



কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতাদশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

—*—

## বোধ স্বরূপ

প্রশ্ন—কি করিয়া মানুষ পরম পুরুষের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া বাঁচিতে পারে?

উত্তর—পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্ব বিষয়ে মনকে বাদ দিতে পারিলে মানুষ তাঁহার মত সর্ব্বজ্ঞ ও স্বাধীন হইতে পারে।

ইহা এক প্রকার যোগস্থ অবস্থা। কিন্তু সাধারণ যোগ হইতে ইহা পৃথক। মন যখন ইষ্ট বিষয়ে যুক্ত হয়, তাহা যোগ অবস্থা। কিন্তু যখন মনকে বাদ দিয়া অভীষ্ট বিষয়ে যুক্ত হয় তাহাই প্রকৃত যোগ অবস্থা। অভীষ্ট বিষয়ে যুক্ত হইবার পূর্ব্বে মন স্বাধীন থাকে। এই অবস্থায় মনের সাহায্যে অভীষ্ট বিষয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া, অভীষ্ট বিষয়ে যুক্ত হইবার পূর্ব্বেই স্বাধীন ইচ্ছায় মনকে ছাড়িয়া অভীষ্ট বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়া যাওয়াই প্রকৃত যোগ অবস্থা এবং তাহাতেই পূর্ণানন্দ লাভ বা ঈশ্বর তত্ত্ব লাভ হয়।

ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় চৈতন্যরূপ দর্শক, কিন্তু জীবাত্মা ইন্দ্রিয় সংযোগে ক্রিয়াশীল, সচল এবং বিবেক সম্পন্ন। কিন্তু যে মনকে ও ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া জীবের ক্রিয়া ও বিবেক সম্ভব হয়, সেই মনকে কোন

কৌশলে বাদ দিতে পারিলে জীবও নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও চৈতন্য স্বরূপ দর্শক হইতে পারে।

নিম্নস্তরের জীবের বিবেক নাই। একমাত্র মানুষই বিবেক সম্পন্ন। সেইজন্যই নিম্নস্তরের জীব স্বভাবতঃই চঞ্চল। মানুষের বিবেক আছে বলিয়া স্থির ধীর শান্ত হইতে পারে।

স্বপ্নাবস্থায় বিবেক থাকে না, সেইজন্য মন চঞ্চল অবস্থায় থাকে।

নিম্নস্তরের জীব প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। মানব মনোযুক্ত ও বিবেকবান বলিয়াই উপায় অবলম্বন করিয়া বিরাট্ চৈতন্য স্বরূপের কাছে যাইতে পারে। মানব আত্মা তিনটি দেহ লইয়া অবস্থান করে, যথা—সূক্ষ্ম, স্থূল ও কারণ। অন্য জীবের সম্বন্ধেও তাহাই। সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ, স্থূলদেহ ছাড়িতে পারে। কেবল কারণ দেহই উভয় দেহ ছাড়িতে পারে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব লইয়া পূর্ণ বিরাট্ চৈতন্যস্বরূপে মিলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু শুধু কারণদেহ হইতে পূর্ণে পৌছান যায় না, উহা অসম্ভব ব্যাপার। কারণদেহের বোধ, স্থূলদেহে থাকা কালেই সম্পূর্ণ হইতে হইবে। কারণদেহের বোধে, স্থূল ও সূক্ষ্মদেহকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে হইবে। এই অবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ একই সঙ্গে ত্যাগ করা সম্ভব এবং কারণদেহ পূর্ণত্ব লাভ করে এবং যাহা ছিল পুনরায় তাহাই হইয়া যায়। ইহাই বোধ স্বরূপ।

সদ্গুরুর কৃপায় ইহা সম্ভব হয়। কি উপায়ে তাহা সম্ভব হয়, তিনিই বুঝাইবেন।

(উপরোক্ত লেখাটি আমি কোথা হইতে লইয়াছি তাহা আমার মনে নাই। অনেকদিন পূর্ব্বে, ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।)

—*—



## সূক্ষ্মদেহ

অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণব্রহ্ম সূক্ষ্ম ও স্থূলভাবে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে সততই বিরাজ আছেন। তাঁহা হইতেই সূক্ষ্মরূপী পুরুষ ও প্রকৃতি আবির্ভূত হয়। সূক্ষ্ম হইতেই স্থূল ভাবের উদ্ভব হয়। সূক্ষ্মদেহে জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। যদিও তাহা অতি দুর্লভ। মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। সাধারণতঃ তাহাকে ভৌতিক আত্মা বলা হয়। কিন্তু স্থূল দেহের পতন হইলেও সূক্ষ্মদেহের প্রবৃত্তি নষ্ট হয় না। তখন প্রবৃত্তিবশে সূক্ষ্মদেহ নানাপ্রকার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের অভাবে কর্ম্ম করা সম্ভব হয় না। তবে সুবিধামত জীবিত দেহে প্রবেশ করে। ব্যবহারিক জগতে তাহাকে 'ভূতে পাওয়া' বলে। কখনও কখনও পূর্ব্বজন্মের অনুভূত বিরুদ্ধ ভাবের প্রবলতাবশতঃ প্রতিহিংসা লইবার উদ্দেশ্যে উৎসুক হইয়া উঠে। এই অবস্থায় সূক্ষ্মদেহ ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করে। কিন্তু ভৌতিক দেহ নিজ প্রবৃত্তির বাহিরে কোনও নূতন কর্ম্ম করিতে পারে না।

স্বপ্নে মন সাধারণতঃ চঞ্চল ও বিবেকহীন ; কিন্তু সাধনা দ্বারা উহাকে স্থির, সুশান্ত ও বিবেকবান্ এবং ইচ্ছানুরূপ গঠন করা যায়।

—*—

### ভাল-মন্দ

## পাপী ও পুণ্যাত্মা

শাস্ত্রে যাহা ভাল বলিয়া গিয়াছে তাহাই ভাল এবং যাহা মন্দ বলিয়া গিয়াছে তাহাই মন্দ। সামাজিক স্থিতি সংরক্ষণের

জন্য আবশ্যক বিধান মতে যাহা ভাল মন্দ, তাহা সব সময় পাপ-পুণ্য বিচারের মাপকাঠি নহে। যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করেন তাঁহার পাপের ভয় নাই। কে পাপী, কে পুণ্যবান্ তাহা বিচার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা যাহাকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করিতেছি, সে মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করিল; এবং যাহাকে পুণ্যবান্ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি, সে মৃত্যুর পর নরকভোগ করিল। ইহা ঘটিয়া থাকে, পুরাণে আছে। পাপ-পুণ্যের বিচার আমাদের করা উচিত নয়। অকারণে কাহারও নিন্দা করা ঠিক নয় বা অযথা কাহারও প্রশংসাও করা উচিত নয়।

—::—

প্রণবের তিন অংশ—সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি। তিন তেজ একাকার হইয়া ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নরূপে বিরাজ করে।

মহামায়ার চরণতলে লুটাইয়া না পড়িলে পূর্ণ সত্যের দ্বার খুলিবে না।

শ্রবণ ভিন্ন মনন হয় না। এমনভাবে নাম (জপ) করা উচিত যাহাতে উচ্চারিত নাম নিজে শুনিতে পাওয়া যায়, অথচ অপরে শুনিতে পাইবে না। মনে মনে নাম করিলেও মনে মনে উহা নিজে শুনা আবশ্যক। ইহা অভ্যাস করিতে হয়। দেহশুদ্ধ প্রয়োজন। নাম যোগে দেহশুদ্ধ হয়। দেহশুদ্ধ অর্থাৎ দেহ শূন্যময় হইয়া যাওয়া—কণ্ঠ হইতে সমস্ত নিম্নভাগ শূন্য হইয়া যায়, কেবল উপরিভাগে চেতনা থাকে।

কুণ্ডলিনীর চেতনা হইলে দেহশুদ্ধির অভাব হয় না।

—●—



অজপাতপঃ; কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত একবার আকুঞ্চন ও একবার প্রসারণ চলিয়া থাকে। সমস্ত চেষ্টাই শুধু কুণ্ডলিনীকে জাগাইবার প্রয়াস করা উচিত। কুণ্ডলিনী জাগিলে ধ্যান আপনিই আসিবে ও যথাসময়ে উহা কাটিয়া যাইবে।

যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সাধন সম্পত্তি সদ্গুরুর নিকট প্রাপ্ত হইয়া যথাবিধি সাধন করিতে না পারিলে লাভ হয় না। এইজন্য জীব কাতর হইয়া ডাকিলে ভগবান্ নিজগুণে কৃপা-পূর্ব্বক তাহার নয়ন পথে উপস্থিত হন এবং গুরুরূপে ভক্তের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন।

ব্রহ্মজ্ঞান অদ্বৈতজ্ঞান এসব অনেক বড় কথা। স্থূলভাবে ভগবৎ দর্শন হওয়া উচিত। গুরু নিত্য; মানুষ কখনও গুরু হইতে পারে না। তবে সদ্গুরু অত্যন্ত দুর্লভ; বেশীর ভাগই ঠকের দল।

সুকৃতি থাকিলেই সদ্গুরু পাওয়া যায়।

রুদ্ধদ্বারে পূজা করা উচিত— সাধনার পক্ষে রাত্রিকালই উপযুক্ত।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্
গুহায়াং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতম্।

—*—

## ঈশ্বর তত্ত্ব

মনকে অস্বীকার করার কোনও কারণ নাই। মনের পিছনে যিনি বসিয়া আছেন তিনি ক্রিয়াশীল নহেন। তিনি নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বদর্শী, শুধু সাক্ষীস্বরূপ। তিনি ক্রিয়াশীল না হইলেও, তাঁহা হইতেই এক প্রকার জীবের আবির্ভাব হয়, যাঁহারা সৃষ্টি ও লয়ের সাহায্য করেন। এই সকল জীব জীব হইলেও ঈশ্বর তুল্য বলিয়া ঈশ্বর নামে

অভিহিত হন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নিষ্কাম, নিষ্ক্রিয় পরমপিতার ইচ্ছায় লীলারূপে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হইয়াছে। অনন্ত বিশ্বের কোনও অংশে সৃষ্টি হইতেছে আবার কোনও অংশে লয় হইতেছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় অনাদি কাল হইতে চলিতেছে এবং অনন্তকাল চলিবে। এই বিরাট ব্যাপারের চালক জীব সকলকে আমরা ঈশ্বর নাম দিয়া থাকি। এই কথা ভাবিলেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয় এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের administration. কিন্তু আরও আশ্চর্য যে সেই বিরাট পুরুষ পরমপিতা পরমেশ্বর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু পরমাণুতে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। আমার মধ্যেও তিনি পূর্ণভাবে রহিয়াছেন।

সৃষ্টির যে ধারা প্রচলিত আছে তদনুসারে ব্রহ্মের সংকল্প হইতেই ঈশ্বরভাবের উদ্ভব হয়। বিশ্বের যাবতীয় বিষয় ঈশ্বরের অধীন। ব্রহ্ম নিত্য চৈতন্য স্বরূপ, যাহা হইতে ঈশ্বর সব কিছু ফুটাইয়া তোলেন। ব্রহ্মে ইচ্ছা ইচ্ছামাত্র— নির্ব্বিষয়ক। ঈশ্বর ও জীবের ইচ্ছা সবিষয়ক। সাধনা দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায় এবং ঈশ্বরও হওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না, ব্রহ্ম হওয়া যায়। ব্রহ্ম হওয়াই পূর্ণত্বলাভ।

আমরা নীতি যোগ প্রভৃতি যে কোন উপায় অবলম্বন করি না কেন, তাহার ফল ঈশ্বর লাভ, ব্রহ্ম হওয়া নহে। জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি ও সাধনার ফলে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় বটে, কিন্তু ব্রহ্ম হওয়া অন্য ব্যাপার। ঈশ্বরাবস্থা হইতে পূর্ণতার দর্শন বা উপলব্ধি হয় মাত্র। মনকে চৈতন্যময় করিয়া লইতে না পারিলে ব্রহ্ম হওয়া যায় না।

সুষুপ্তিতে মন থাকে না— বায়ুতে লীন হয়। সংস্কার আদি সবই মনেই থাকে। বায়ুতে লীন না হইয়া জীবাত্মাতে লীন হইলেই



ভাল। জীবাত্মাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া যেমন পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, সেইরূপ মনকে ডুবাইয়া না দিয়া জীবাত্মাকে জানা যায়। মনকে অতিক্রম করিতে পারিলে জীবাত্মা দ্রষ্টা হয়। মনহীন আত্মা বিরাট আত্মার দ্রষ্টা ও বিরাট আত্মা জীবাত্মার দ্রষ্টা। কারণ দেহ মহাকারণের প্রকৃতি। কারণ মহাকারণের ইচ্ছাতে স্পন্দিত হইয়া প্রকৃতিবিকাশবশতঃ ক্রমে সুক্ষ্ম ও স্থূলে বেষ্টিত হয়। মহাকারণের পূর্ণত্ব নষ্ট হয় না, পূর্ণভাবেই দ্রষ্টা হয়।

"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

মনের কার্য্য যখন হয় তখন মনের বিকার হয় উহাই জীবভাব। মন যখন ইন্দ্রিয়ে নামার ইচ্ছা করে অথচ নামে না তখন মন চঞ্চল থাকে। এই নামার চঞ্চল পূর্ব্বাবস্থা থাকার জন্যই 'বাসনা'। 'বাসনা' বলিতে সাধারণতঃ বুঝায়, কামনা, অভিলাষ, প্রত্যাশা। যখন 'বাসনা' থাকে না তখন মন নিষ্ক্রিয় থাকে। মন অহঙ্কারে লীন হয় এবং অহঙ্কার বুদ্ধিতত্ত্বে লীন হয়। এক কথায় মন যাহা হইতে উঠে তাহাতেই লীন হয়। মনকে অবশ্য পৃথক রাখাও সম্ভব হয়। মনকে পৃথক রাখিতে হইলে একটি 'লক্ষ্য' বা অবলম্বন চাই। ইহাই 'বিরাট লক্ষ্য'। আত্মাতে মনকে পৃথকভাবে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। মন তখন চৈতন্যময়, আত্মাও তাই। মন সম্বন্ধে আবার লিখিব পরে।

উপরোক্ত বিষয় সদ্‌গুরুর নিকট খুব ভালভাবে বুঝিয়া, তাঁহার আদেশ মত অভ্যাসের দ্বারাই আয়ত্ত হওয়া সম্ভব। গুরু সাংসারিক বিষয় হইতে মুক্তিদান করেন। সাংসারিক বিষয় হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শিষ্য সাধন করিতে আরম্ভ করে। সাধনা পূর্ণ হইলে তাহার

নাম সিদ্ধি। ইহাই মানব জন্মের একমাত্র লক্ষ্য। সাধনের উদ্দেশ্যই মুক্তি লাভ। এ সম্বন্ধে আবার লিখিব।

—::—

## কুণ্ডলিনী

মনুষ্য দেহধারী প্রত্যেক জীবের মূলাধার চক্রে কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিত রহিয়াছে। এই শক্তিকে জাগাইতে পারিলে, সাধন-ভজন যাহা কিছুই অনুষ্ঠিত হউক, তাহা অল্পাধিক পরিমাণে বাহ্য ব্যাপারে পর্য্যবসিত হয়।

কুণ্ডলিনী জাগরণ হইতেই সাধনার সূত্রপাত। শিবরূপী আত্মা বিশুদ্ধ চক্রে শবরূপে অবস্থান করিতেছে। ইহা গভীর প্রসুপ্তি। এই শবরূপী শিবকে না জাগাইতে পারিলে আত্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া সুদূর পরাহত। কিন্তু শক্তি ভিন্ন এই সুপ্ত শিবকে জাগাইবার অন্য কোনও উপায় নাই। অথচ শক্তি স্বয়ং নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া আধার চক্রে জড় পিণ্ডবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। কাজেই সাধকের প্রথম কর্ত্তব্য শক্তিকে জাগ্রত করিয়া শবরূপী শিবকে প্রবুদ্ধ করা।

এখানে সপ্তভূমি ও ষট্‌চক্র সম্বন্ধে কিছু জানাইয়া তাহার পর এই বিষয়ে অগ্রসর হইব। দেহের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ স্থানকে সপ্তভূমি নাম দেওয়া হইয়াছে, যথা, লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, কপাল ও শিরোদেশ। এই ভূমিগুলিতে এক একটি চক্রের স্থান। যথা, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। শিরোদেশে সহস্রারকে চক্র বলে না। মূলাধার হইতে বিশুদ্ধ চক্র পর্যন্ত পাঁচটি চক্র পাঁচটি ভৌতিক তত্ত্বের কেন্দ্র। শক্তি ব্যাপক



ভাবে সর্ব্বত্রই সুপ্ত রহিয়াছে। শক্তি এক ও অভিন্ন। তথাপি চক্রভেদে তাহার স্থিতি পৃথক পৃথক। মূলাধার চক্রে শক্তি জাগ্রত হইলে তাহার প্রভাবে স্বাধিষ্ঠান চক্রস্থিত শক্তি জাগ্রত হয়। এই প্রকার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চক্রের শক্তির জাগরণও বুঝিতে হইবে। মোট কথা একই শক্তি জাগ্রত হইয়া যেমন যেমন সুষুম্নার পথে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে, তেমন তেমন তাহার জাগরন ক্রমশঃ অধিক উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হইতে থাকে এবং চরম অবস্থায় শক্তি পূর্ণ জাগরন কালে পাঁচটি চক্রই মুক্ত হইয়া যায়। এই অবস্থায় অর্থাৎ আকাশ তত্ত্বে শক্তির পূর্ণ জাগরণের ফল শবরূপী শিব জাগ্রত হন। তখন আজ্ঞাচক্রে ভ্রু-মধ্যস্থলে শিব-শক্তির মিলন সংঘটিত হয়। তবে এ মিলন পূর্ণ মিলন নহে। আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রার পর্যন্ত মহামিলনের পথ। চিদাকাশ সহস্রারের অন্তর্গত। মহামিলন পূর্ণভাবে সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আত্মদর্শন হইয়া থাকে।

গুরুর কৃপা ছাড়া কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয় না। যিনি শিষ্যের কুণ্ডলিনী জাগাইয়া তাহাকে চক্রভেদ করিতে সাহায্য করেন তিনিই 'গুরু'।

ষট্‌চক্র ভেদের পর বিশ্বভেদ যাঁহার কৃপায় হয়, তিনি বিশ্বগুরু। যাঁহার কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত হয়, তিনি 'ব্রহ্মগুরু'। যাঁহার কৃপায় আত্মসাক্ষাৎ হয় তিনি 'সদ্‌গুরু'।

সাধনার বহু পথ জগতে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত সত্যপথ কুণ্ডলিনী জাগরন না হইলে উন্মুক্ত হয় না। কুণ্ডলিনী জাগরন শিবশক্তিরূপে ঘটিয়া থাকে। ইহার ফলে ক্রমশ মূল প্রকৃতি-দর্শন, মহামিলন এবং আত্মদর্শন সংঘটিত হয়।

মূলধার হইতে কুণ্ডলিনীর গতি উর্দ্ধ দিকে এই প্রকারে হইয়া থাকে :—

১। পিপীলিকা গতি= সুড় সুড় করিয়া, পা হইতে সুড় সুড়ানী আরম্ভ হইয়া মাথা অবধি উঠে—তখনই সমাধি।

২। ভেকগতি=টুপ, টুপ, টুপ, তিনবার লাফাইয়া থামে—আবার দু তিন বার লাফায় আবার থামে। এইরূপে মাথা অবধি উঠে তখন সমাধি।

৩। সর্পগতি= কিল্ কিল্ আঁকাবাঁকাভাবে ছুটে মাথা অবধি উঠিয়া সমাধি।

৪। পক্ষীগতি= উঠিয়া গিয়া এক যায়গায় বসে, আবার নীচের ডালে উড়িয়া গিয়া বসে এইভাবে মাথা অবধি উড়িয়া যায় তখন সমাধি।

৫। বাঁদরগতি= লাফাইয়া লাফাইয়া দু তিন লাফ্ দেয়—এ ডাল ও ডাল লাফায়—শেষে মাথা অবধি উঠে—তখন সমাধি।

মুলাধার চক্রেই কুণ্ডলিনীর জাগরণ আরম্ভ হয়। ব্যোমতত্ত্বের কেন্দ্র বিশুদ্ধ চক্রে; এই জাগরণ অনেকটা স্বভাবতই হয়। শাস্ত্রে আছে, নাভিমূলে ইষ্টদেবতার আরাধনা করিলে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়।

কুণ্ডলিনী জাগরণের সঙ্গে জ্ঞানের জাগরণ হয়। আত্মার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উদয় হয় এবং শেষে শিবরূপে প্রকাশিত হয়। কুণ্ডলিনীর জাগরণের অর্থ শক্তি জাগরণ। এইখানেই শিবশক্তির খেলা আরম্ভ। যুগল দর্শন— জ্যোতি দর্শন। যদিও পরে সবই দর্শকের একাত্ম হইয়া যায়। উহাই আত্মদর্শন। আজ্ঞাচক্রেই এই মিলনের আভাস পাওয়া যায়। পূর্ণ মিলন বা



মহামিলন হয় সহস্রারে। ক্রমশ দর্শকের দেহে ও আত্মায় নানা-প্রকার লীলা ফুটিয়া উঠে। ইহাকে 'নিত্যলীলা' বলে। ইহা ব্রহ্ম নয়, তবে ব্রহ্মাবস্থা। ইহা এক মহানন্দের অবস্থা— ইহা নিত্যলীলায় প্রতিষ্ঠিত। চিৎসত্তার সহিত যুক্ত হইলে, চিতই প্রধান হয় এবং আনন্দ হয় তাহার অন্তর্গত। চিৎব্রহ্মে স্থিতি-লাভ অন্য ব্যাপার, — দেহ থাকিতে তাহা ঘটে না। গুরুকৃপায় দেহ থাকিতে যদি চিতকে সতে যুক্ত করিতে পারা যায় তাহা হইলে দেহান্তে সদ্‌ব্রহ্ম স্থিতি হইতে পারে। আনন্দের তরঙ্গ পার হইয়া এই লীলাতীত নিস্তরঙ্গ অবস্থায় পৌঁছান কঠিন ব্যাপার। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশীতে শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম—তিনি তখন এক ভদ্রলোকের সহিত হিন্দীতে এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। সিদ্ধিমাতার সম্বন্ধেও তিনি এই কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখা 'সাধুদর্শন ও 'সংপ্রসঙ্গ' পাঠ করিলে এ বিষয়ে আরও ভালভাবে বুঝা যাইবে। অনন্ত ব্রহ্ম অনন্তভাবে প্রকাশ—কি মনুষ্য, কি দেবতা, কাহার সাধ্য এই অনন্তের এক কণাও ভেদ করে। এই অনন্তের একমাত্র বিকাশ 'ওঙ্কার' হিন্দুশাস্ত্রে জানা আছে।

এই ওঙ্কারের পশ্চাতে যে আরও কত অনন্ত বিকাশ আছে তাহা কি আমরা জানিতে পারি? তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে অনন্ত কখনও কোনও ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ হইতে পারে না—ওঙ্কারেও নহে।

আমাদের মুনি ঋষিরা ধ্যানে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন—বিচার দ্বারা, প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা যাহা জানিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্ররূপে আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন— তাহাই আমাদের

জ্ঞানের ভাণ্ডার। কিন্তু সেই জ্ঞান-ভাণ্ডার অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানের এক কণা মাত্র। অনন্ত ব্রহ্মে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। আমাদের পৃথিবী যে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত তাহার খবর আমাদের কণামাত্রই জানা সম্ভব হইয়াছে, কাজেই অনন্ত ব্রহ্মের যিনি অধিকারী তাহার খবর লইতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। কাজেই একমাত্র পথ ব্রহ্মময়ী মায়ের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হওয়া।

গুরুদত্ত শক্তি সুপ্ত কুল কুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া দেয়। কুণ্ডলিনী জাগরণ হইতেই প্রকৃত সাধনার সূত্রপাত হয়।

পূর্ব্বে যে আত্মদর্শনের কথা বলিয়াছি, তাহাই শেষ কথা নয়। ব্রহ্মাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্ম-সাক্ষাৎ প্রয়োজন। আনন্দের অতীত পরাশান্তি চাই। তখন জগৎ ব্রহ্মময় প্রতীত হয়। ইহার জন্য আবশ্যক জাগ্রত ব্রহ্মমন্ত্র। ইহা ভগবৎ কৃপা ছাড়া পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, নির্জ্জনে, গোপনে গান গাহিবে :—

"জাগো মা কুণ্ডলিনী।
তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিনী, প্রসুপ্ত
ভুজগাকারা আধার পদ্মবাসিনী।"

—*—

## 'ধারণা'

যোগশাস্ত্রে সাধারণ সাধকগণের অনুষ্ঠিত 'ধারণা' নামক প্রক্রিয়াকে দেহধারণা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে 'ধারণা' একটি অঙ্গ। চিত্তকে নিজ দেহের এক বিশিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখার নাম 'ধারণা'। 'ধারণা' হইতেই



অন্তরঙ্গ সাধনের আরম্ভ হয়। প্রত্যাহার প্রভৃতি পাঁচটি বহিরঙ্গ এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি অন্তরঙ্গ।

হৃদয়ে, ভ্রূমধ্যে, নাসাগ্রে প্রভৃতি বিশিষ্ট স্থানে যথাবিধি ধারণা করিতে পারিলে বিশিষ্ট ফললাভ হয়। এই সকল ধারণা শুধু 'ধারণা' নামে পরিচিত হইলেও বস্তুতঃ দেহধারণেরই প্রকার-ভেদ।

যখন দেহের অন্তরঙ্গ সাধনে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় আসে, তখন চিত্তকে তাহার বহুমুখী বৃত্তি হইতে মুক্ত করিয়া এক মুখে প্রবাহিত করিতে হয়।

বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যাহার পর্য্যন্ত যে সকল সাধনা, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য চিত্তের বহুমুখী গতি নিরুদ্ধ করিয়া তাহাকে এক দিকে চালনা করা। ইহার জন্যই নৈতিক সংযম এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সহিত দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহকারিতা আবশ্যক। যম, নিয়ম প্রভৃতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নৈতিক জীবনের মহান্ আদর্শের পরিচালনা মাত্র। কারণ উহারই উপর আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আসন-সাধনের মূল উদ্দেশ্য দেহকে স্থির রাখা। দেহকে স্থির করিতে পারিলে, প্রাণশক্তির স্থিরতার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়।

আসনে বসিয়া শান্ত ভাব আসিলে, গুরু উপদেশে প্রাণায়াম ক্রিয়ার ফলে স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি জন্মে। এইরূপ অভ্যাস দ্বারা প্রাণ শান্ত হইলে, মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের ও বিষয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাই 'প্রত্যাহার'। প্রত্যাহারে সাফল্য লাভ করিলে, অন্তরঙ্গ সাধনা আরম্ভ হয়।

সকলের 'ধারণার' বিষয় এক হইতে পারে না। সদ্গুরু শিষ্যের যোগ্যতা বিচার করিয়া ধারণার বস্তু ও স্থান ঠিক করিয়া দেন। ধারণার দ্বারা চিত্ত ক্রিয়াশীল হইয়া চিন্তানিবিষ্ট স্থানে বৃত্তিরূপে উদয় হয়।

'ধারণা' কয়েকপ্রকার আছে। যথা—বিদেহ-ধারণা, মহাবিদেহ ধারণা।

বিদেহ ধারণাতে চিত্তের বৃত্তি দেহের বাহিরে উদয় হয়। যদিও চিত্ত দেহের মধ্যেই থাকে এবং ধারণার বিষয়ীভূত বস্তু সম্বন্ধে বৃত্তিরূপে যাবতীয় জ্ঞান চিত্তে উদ্ভূত হইতে পারে। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর ধারণা 'মহাবিদেহা'। ইহাতে চিত্তের সত্তা ও চিত্তের বৃত্তি দুই-ই দেহের বহির্ভূত হয়। এই ধারণায় দক্ষ হইতে পারিলে যোগীর চিত্তে ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যাদি কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম, এবং ত্রিবিধ বিপাক অর্থাৎ জন্ম, আয়ু ও ভোগ এইগুলি অপসারিত হয়। শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের পুস্তকে পরদেহে প্রবেশের কথা পড়িয়াছি। কি উপায়ে তাহা সম্ভব হয় তাহা সে পুস্তকে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া নাই। এই মহাবিদেহা ধারণার সাহায্যে গুরুশিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিব্যজ্ঞান দিয়া থাকেন। ইহা আর বিশেষ লিখিলাম না, কারণ এই সকল ব্যাপার সদ্গুরুর শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করাই শ্রেয়।

—*—

## মহাজ্ঞান

জ্ঞান সাধারণতঃ দুই প্রকার :—অন্যের উপদেশ দ্বারা যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয় তাহা পরমপরাক্রমে শাস্ত্র ও গ্রন্থাদির দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়রূপ জ্ঞান জিজ্ঞাসু হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত



হয়। তাছাড়া আর একপ্রকার জ্ঞান আছে যাহাকে দিব্যজ্ঞান বলে। তপস্যা, আরাধনা, বিবিধ কর্ম্ম, ভজন প্রভৃতি দ্বারা যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার যথার্থ সার্থকতা থাকিলেও তাহা দিব্যজ্ঞান নহে। আত্মার পরম স্বরূপ যে শিবত্ব, যাহা দ্বারা ভগবত্তা অভিব্যক্ত হয়, তাহাই দিব্যজ্ঞান বা 'শিবজ্ঞান'। আত্মা স্বয়ং অনন্ত শক্তি সম্পন্ন, নিত্যমুক্ত শিবের সহিত অভিন্ন। এই দিব্যজ্ঞান শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত জীবের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। ইহাই মহাশক্তি এবং পরমেশ্বরের সহিত অভেদাবস্থা। কিন্তু এই 'দিব্যজ্ঞান' বহির্মুখে এবং নিম্নাভিমুখে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ইহাই জ্ঞানের নিরন্তর লীলা। এই জ্ঞানই 'পরাবাক্'রূপে প্রসিদ্ধ। অন্তর্মুখে এই বাক্ পরমস্বরূপ মহাপ্রজ্ঞা-রূপে নিহিত আছে। অথচ বহির্মুখে জীব-জগতের কল্যাণের জন্য মহাকরুণারূপে নিম্নাভিমুখে সঞ্চারিত হইতেছে।

কত গুহ্য বিষয় জানিবার আছে তাহার শেষ নাই। যেখানে যাহা পাইলাম সংক্ষেপে লিখিলাম, কারণ সকলের পক্ষে বিভিন্ন পুস্তক যোগাড় করিয়া পড়া সম্ভব নয়। পূর্ব্বে যখন তন্ত্রের কথা লিখিয়াছি, তখন অতি সামান্যই লিখিয়াছি, কারণ ইহা বুঝিতে হইলে পাঠককে অধ্যাত্ম জগতে কিছুদূর অগ্রসর হইতে হইবে। সেইজন্য এখানে আবার তন্ত্রের কথা কিছু বলিতেছি। পরাবাকের ভূমি হইতে নামিলে যে ভূমিতে নামে তাহাকে পশ্যন্তীভূমি বলে— এই-খানেই বেদ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। জগতের যাবতীয় শাস্ত্র মধ্যমা ভূমিতে নামিয়া আসে। গুরুমণ্ডল এই ভূমি হইতেই এই সকল দিব্যজ্ঞানের রাশিকে বৈখরীতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তখনই উহা সকলের বোধগম্য ভাষাতে প্রচারিত হয়।

হৃদয়ই মধ্যমা বাকের লীলাক্ষেত্র। গুরুর অর্থাৎ গুরুরূপী শিবের পঞ্চবক্ত্র তাঁহার স্বাভাবিক পঞ্চশক্তির মূর্ত্তিরূপ। এই পাঁচটি শক্তির নাম— চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। গুরুর এক একটি মুখ হইতে এক একটি জ্ঞানের ধারা বিভিন্ন অবান্তর ভেদবিশিষ্ট হইয়া বহির্জগতে প্রকাশিত হয়। সেইজন্যই শিবমুখ-নিঃসৃত এই মহাজ্ঞানের নাম 'আগম'।

তন্ত্রশাস্ত্র অত্যন্ত জটিল, গুরুমুখে শ্রবণ না করিলে ইহার ভিতর প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন। 'মধ্যমা' সম্বন্ধে কিছু বলিয়া তন্ত্রের কথা এইখানেই শেষ করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি বাকের লীলাক্ষেত্র 'মধ্যমা'। বাকের ক্রিয়া কি তাহা কিছু জানার প্রয়োজন। পশ্যন্তীর জ্যোতি এখানে থাকে না, তবে আলোর আভাস কিঞ্চিৎ থাকিয়া যায়। শব্দ ও অর্থের ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকে। অর্থ শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং নাদরূপে স্ফুরিত হয়। সৃষ্টিমুখী গতির তীব্রতা বশতঃ মন ও বায়ু আসিয়া বাগ্‌যন্ত্রের উচ্চারণ স্থানে আঘাত করে ও বর্ণের অভিব্যক্তি হয়। বর্ণ ও বর্ণমূলক পদ বাক্যাদি ভাষারূপে কণ্ঠ হইতে ওষ্ঠ ভেদ করিয়া বায়ুমণ্ডলীতে লীন হয়।

হৃদয়ে বাকের যে প্রকাশ ঘটে তাহার নাম মধ্যমা ও কণ্ঠে যে প্রকাশ ঘটে তাহার নাম বৈখরী। বৈখরীতে শব্দ ও অর্থ পৃথক হইয়া যায়। জ্ঞান ও জ্ঞেয় বা অর্থ পৃথক হয়। সেইরূপ শব্দ ও জ্ঞান পৃথক হয়।

হৃদয়রূপী বিরাট আকাশে সকল জ্ঞানই নিত্যস্বরূপে বিধৃত রহিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে কোনও জ্ঞানেরই লোপ হয় না। শক্তিশালী যোগী ঐ সকল জ্ঞানকে ফুটাইয়া কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারেন। প্রলয়ের সময় বিশ্বরূপ অর্থের ন্যায় বিশ্বশাস্ত্রও কারণ



সলিলে ডুবিয়া যায়। গুরুরূপী ভগবান সেগুলি পুনর্ব্বার উদ্ধার করেন।

"প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদম্॥"

—*—

## প্রারব্ধ

প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগের জন্যই শরীর গ্রহণ করিতে হয়। যতদিন শরীর দ্বারা ঐ ভোগ সমাপ্তি না হয়, ততদিন শরীর ধারণ আবশ্যক হয়। অতএব জন্ম, মৃত্যু ও ভোগ প্রারব্ধের ফল। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল বিনা বিচারে ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলেই উহা কাটিয়া যায় নতুবা ভোগ করিলেও অভিনব কর্ম্মবীজ সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

মনুষ্যের দেহ কর্ম্মদেহ ও ভোগদেহ উভয়ই। প্রকৃতির নিয়মে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব সর্ব্বশেষে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়। "যোনেঃ শরীরম" নরযোনি শ্রেষ্ঠ যোনি। নরদেহ শ্রেষ্ঠ দেহ। এই দেহ একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। যাহা কিছু বাহ্য জগতে আছে তাহা সবই মনুষ্য দেহে আছে। দেহকে ক্ষেত্র বলা হয়, কারণ মন ও প্রাণ দ্বারা ইহাকে যথাবিধি কর্ষণ করিয়া ইহাতে গুরুবীজ বপন করিতে পারিলে ইহা হইতে কল্পবৃক্ষের উৎপত্তি হয়, যাহা যথাসময়ে অমৃত ফলপ্রসব করে।

চেতন ও অচেতন উভয় সত্তার সংঘর্ষে দেহ উৎপন্ন হয়। এই বিষয়ই আবার অন্যভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি কারণ ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

—*—

তুরীয় ও তুরীয়াতীত অবস্থা। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি পশু প্রভৃতিতেও হইয়া থাকে, কিন্তু তুরীয় ও তুরীয়াতীত অবস্থা একমাত্র মনুষ্যেই সম্ভব। এইজন্য কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ যোগের অভ্যাস শুধু মনুষ্য দেহেই হইতে পারে। যোগরূপ কর্ম্মই বিশুদ্ধ কর্ম্ম। পাপ পুণ্যের অতীত শুদ্ধ আত্মকর্ম্মের জন্যই এই দেহ ধারণ করা হইয়াছে। বিনা বিচারে প্রারব্ধ কর্ম্মফল স্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া; আত্মকর্ম্ম করিয়া, ভাগ্য থাকিলে সেই শুদ্ধ কর্ম্ম প্রভাবে এমন পথ পাওয়া যায়, যাহা আশ্রয় করিলে আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়।

সংসারে থাকিতে হইলে আত্মকর্ম্ম ছাড়া আরও অনেক কর্ম্ম করিতে হয়। নিষ্কামভাবে সেই সকল কর্ম্ম করিলে ফলভোগ করিতে হয় না। প্রভু করাইতেছেন তাই করিতেছি, এই ভাব লইয়া কর্ম্ম করা উচিত। হাসিলে কাঁদিতে হইবে। পার্থিব আনন্দে কেবল নিরানন্দ ডাকিয়া আনে। যদি কাঁদিতে না চাও তাহা হইলে হাসিও না। যদি নিরানন্দ না চাও তাহা হইলে আনন্দ করিও না। যদি আনন্দ করিতে চাও তাহা হইলে প্রভুকে লইয়া আনন্দ কর—একমাত্র উপায় সাধু সঙ্গ ও তাঁর কৃপা। এই দুই-এর জন্যই তাঁহার নিকট শরণাপন্ন হইতে হইবে।

আত্মকর্ম্মের দ্বারা আত্মিক স্থিতির উৎকর্ষ সাধন হয়, কিন্তু চৈতন্য শক্তির উন্মেষ না হইলে আত্মকর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। প্রতি মানুষের দেহে এই শক্তি কুলকুণ্ডলিনী নামে নিহিত আছে।

সদ্‌গুরু সাক্ষাৎ ভগবৎশক্তিসম্পন্ন হইলেও শিষ্যের আধারের বলবত্তার উপর তাঁহার সঞ্চারিত শক্তির ফল—প্রকাশ নির্ভর করে। যে শরীরে যে আধারে যে পরিমাণ শক্তির ধারণা সম্ভবপর



সদ্‌গুরু সেই আধারে তাহার অধিক শক্তি সঞ্চারিত করেন না। তারপর সাধক স্বয়ং নিজ কর্ম্মের দ্বারা ঐ শক্তির উন্মেষের অগ্রগতি সম্পাদন করে। সাধক কর্ম্ম দ্বারা গুরু হইতে প্রাপ্ত জ্ঞানাগ্নির স্ফুলিঙ্গকে নিজ সত্তায় সম্পূর্ণভাবে বিস্তারিত করে এবং কর্ম্ম-সংস্কারগুলি নষ্ট হইতে থাকে। ইহাই ইষ্ট সাধনার ক্রম। সাধকের ইষ্ট দেবতা 'কুলকুণ্ডলিনী' শক্তি ছাড়া অপর কেহ নহে। সাধক যে নাম যে রূপেই গ্রহণ করুন না কেন, একমাত্র কুণ্ডলিনীই তাহার ইষ্ট।

সাধকের সাধনা যেখানে সমাপ্ত, যোগীর সাধনা বস্তুতঃ সেইখান হইতেই আরম্ভ। সাধকের আত্মকর্ম্মের ফলে বাসনা, কামনাদি সংস্কার ও মূল বীজ নির্ম্মল হইয়া চিদালোকে পরিণত হয়। সাধকের সত্তা চিৎসত্তার সঙ্গে একাকার হইয়া যায় এবং দেহ-মন প্রভৃতি এই সিদ্ধাবস্থাতে চিন্ময় আত্মস্বরূপে স্থিতি সম্ভব হয়।

সাধকের উদ্দেশ্য কৈবল্য লাভ, বিদেহ কৈবল্য। সাধকের লক্ষ্য কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া নিষ্কাম চিৎস্বরূপে অবস্থান। যোগীর লক্ষ্য মলিন কামকে শুদ্ধ করিয়া ভগবৎ প্রেমরূপে পরিণত করা। সাধক জ্ঞান-প্রাপ্ত হয় এবং সেই জ্ঞানের অনলে অশুদ্ধ বাসনা দগ্ধ করিয়া মায়িক উৎপত্তির মূলবীজ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। এই অবস্থা হইলে পতন হয় না। গুরু তাহাকে সামর্থের অনুরূপ জ্ঞানই প্রদান করেন। এই জ্ঞান প্রদানের সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সৎগুরু ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি সঞ্চার করান যাহাতে তাহার কুণ্ডলিনী শক্তি উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উর্দ্ধগতি অবলম্বনপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে সমর্থ

হয়। যে সকল অশুদ্ধ বাসনা সাধকের অন্তর্নিহিত জ্ঞান শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সেগুলি গুরুকৃপায় কুণ্ডলিনী জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ হইয়া যায়। ইহার ফলে সাধকের অন্তরাত্মা শুদ্ধ হইয়া গুরুদত্ত চিন্ময়ী-শক্তিস্বরূপ ইষ্টের আকার ধারণ করে।

এইজন্য সাধকের দীক্ষার পর তাহার যথাবিধি নিজকর্ম্ম প্রভাবে প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনী শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ চৈতন্যরূপে আত্ম-বিস্তার করে, এবং ধীরে ধীরে সমস্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকে চিন্ময়ত্ব দান করে। অশুদ্ধ বাসনা দূর করাই চিৎশক্তির কার্য্য। ক্রমে অশুদ্ধ বাসনা সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যায়। তখন নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের উদয় হওয়ায় বাসনামুক্ত হইয়া নিজেকে ইষ্টের সহিত অভিন্নরূপে দর্শন করে। ইহাই ইষ্ট-দর্শন বা আত্মদর্শন। গুরুকৃপাকে আশ্রয় করিয়া সাধক নিজ শক্তি প্রভাবে সম্যক জ্ঞান লাভ করে এবং সিদ্ধাবস্থায় চিদাকাশে স্থিতিপ্রাপ্ত হয়। তবে দেহাবস্থায় থাকিতে থাকিতে সাধনকর্ম্ম সম্পূর্ণ করিতে হয়, নচেৎ চিদাকাশে স্থিতি ঘটে না। তথাপি প্রকৃতির স্রোতে তাহার তত্ত্বকে চিদাকাশের দিকে টানিয়া লইয়া যায়, কিন্তু সাধক তাহা বুঝিতে পারে না

—●—

যে বিষয় বুঝা কঠিন তাহা বার বার লিখিব, নানাভাবে পাঠকের সুবিধার জন্য।

জীবের তিনটি পর্য্যায়।

প্রথম আত্মা,— যাহাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের অহংভাব জীবনের কেন্দ্রস্বরূপে আছে।



দ্বিতীয় কারণ বর্গ,— যাহাতে আমাদের অন্তঃকরণ ও বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহ অন্তর্গতভাবে বিদ্যমান আছে; এবং

তৃতীয় স্থূলদেহ।

জাগ্রত অবস্থায় আমাদের অহংভাব এই স্থূল শরীরকে আশ্রয় করিয়া কার্য করে। স্বপ্নে কারণবর্গকে আশ্রয় করে; সংস্কার সমষ্টি ও প্রাণময় কোষ এই স্তরে নিহিত। সুষুপ্তিতে এই অহংভাব লীনবৎ হইয়া কেন্দ্রে বিদ্যমান থাকে। সাধক সাধন বলে নিজের বোধকে ক্রমশ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে ও সূক্ষ্ম হইতে কারণে সমাপ্ত করে।

তাহার পর কারণ হইতে যখন ঐ 'বোধ' শক্তি বাহির হয় তখন উহা প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া নিজ স্বরূপে অর্থাৎ চিৎস্বরূপে অবস্থিত হয়। বিবেক হয় প্রথমে কারণ— ভাবাপন্ন অচিৎ হইতে এবং শেষে তার প্রতিষ্ঠা হয় নিজ স্বরূপভূত চিৎ সত্তাতে। ইহাই কৈবল্য। ইহাই সাধকের সাধন। প্রচলিত যোগমার্গেরও ইহাই লক্ষ্য।

পূর্ব্বে যে যোগের কথা বলিয়াছি তাহা ইহা হইতে বিভিন্ন ও অত্যন্ত গভীর। বস্তুতঃ অচিৎ ঠিক অচিৎ নহে। জ্ঞানের উজ্জ্বলতা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিন্ময় হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। বিজ্ঞানের দ্বারা এই রূপান্তর সিদ্ধ হয়। তান্ত্রিক যোগীর উদ্দেশ্য শিবত্ব-লাভ। মহাশিবের অবস্থা, পরমেশ্বরের সহিত ঐক্যভাব। ভগবত্তার পূর্ণ অভ্যুদয় তখনই সম্ভব হয়। বিশেষ যোগক্রিয়া ব্যতিরেকে ইহা সিদ্ধি হয় না।

—*—

## মৃত্যু ভয়

যতদিন মানুষের জীবভাব থাকিবে, ততদিন মরণের ভয় হইতে নিষ্কৃতি নাই। উপায়, একমাত্র ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া—ঈশ্বরের চরণে

আত্মসমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকা। আর একটি দিক আছে। 'যেমন, আমি পাপী, তাপী, দীন, হীন আমার কি হইবে—তিনি যদি দয়া করিয়া আমায় রক্ষা করেন। ইহা ভাল নয়, কারণ ইহা নিরাশার অবস্থা। মৃত্যু হইবেই; মৃত্যুর হাত কেহ কি এড়াইতে পারে? কাজেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে টাকা পয়সার এবং নানা পার্থিব জিনিষের প্রয়োজন হয়। সেইরূপ মৃত্যুর পর শান্তিতে থাকার জন্য বহু জিনিষের প্রয়োজন হয়। আমাদের মুনি ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন মৃত্যুর পর আমাদের আত্মার শান্তির জন্য কি কি জিনিষের প্রয়োজন হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বেই সেই সকল জিনিষ যোগাড় করিতে হয়। মৃত্যুর পর আর কোনও নূতন কিছুর যোগাড় হওয়ার আশা নাই। সব জিনিষ যোগাড় হইয়া গেলে আর ভয় কিসের? তখন যাইবার জন্য মন ছট্ ফট্ করিবে। জিনিষ বলিতে অতি সামান্য, নিষ্কাম কর্ম্ম ও সতত হরিনাম। যাওয়া দুই প্রকার। যথা—জেলে যাওয়া, হাতে হাত কড়া দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া; আর তীর্থ যাত্রা—সব জিনিষপত্র লইয়া বাহির হইলেন—শীঘ্র ষ্টেশনে পৌঁছাইতে হইবে, নচেৎ গাড়ী ছাড়িয়া যাইবে—যাইবার জন্য মন ছট্ ফট্।

শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু ভয় ছিল না, বিরহ-ব্যথা তিনি সততই ভোগ করিয়াছেন। বিষয় ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য মায়ার বন্ধন হেতু বাঁচিবার ইচ্ছা আর মৃত্যু-ভয় এক জিনিষ নয়। মায়ার বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায় বিষয় বৈরাগ্য ও আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে থাকা। 'মরণভয়' সম্বন্ধে বিশেষভাবে



জানিতে ইচ্ছা করিলে, ৺ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত 'অভয়ের কথা' গ্রন্থখানি পড়িবেন।

—::—

## জপাৎ সিদ্ধিঃ

ইহা তন্ত্রের কথা— জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধির্ণসংশয়'। তবে এই জপ বিধিমত হওয়া প্রয়োজন। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত "বৃহৎ তন্ত্রসার" গ্রন্থটি পাঠ করিলে, গুরুকরণ, দীক্ষা, জপ ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান হইবে। কিভাবে জপ করিতে হয় তাহা গুরু শিষ্যকে দীক্ষার সময় শিখাইয়াছেন।

—●—

## কুলকুণ্ডলিনী ও যোগ

পূর্ব্বে কুণ্ডলিনী শক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছি। ইহা আরও ভাল-ভাবে জানা প্রয়োজন, সেজন্য আবার লিখিতেছি। সারদাতিলকে উক্ত আছে, যাবত্যঙ্গুল বিস্তৃত এই চৈতন্য ও জড় এই উভয়রূপী গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যভাগে দুই অঙ্গুলী উচ্চে একটি কন্দ বিদ্যমান আছে। ইহার বিস্তার দেহের দ্বিগুণ, উহা বৃত্তাকারে শোভিত। এই কন্দকেই মূলাধার বলে। উহাতে নাড়ী সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটি নাড়ী প্রধান।

উহার মধ্যে বামদিকের নাড়ীকে 'ইড়া', দক্ষিণদিকের নাড়ীকে পিঙ্গলা, মধ্যস্থলের নাড়ীকে সুষুম্না কহে। এই সুষুম্না মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে।

এই সুষুম্না নাড়ী নিম্নে দুইটি শিকড় দ্বারা দুই চরণের দুই অঙ্গুষ্ঠে গিয়াছে, এবং শিরোভাগ দ্বারা ব্রহ্মস্থান পর্যন্ত গিয়াছে। এই এই নাড়ী চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ।

এই সুষুম্না নাড়ীর মধ্য ভাগে যোগিগণের প্রিয় যে আর একটি নাড়ী আছে, তাহাকে চিত্রা কহে। এই চিত্রনাড়ীতেই মৃণাল সূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম ব্রহ্মরন্ধ্র বিদ্যমান। এই নাড়ীতে কতকগুলি আধার— (ভিন্ন ভিন্ন মতে আধারও বহুবিধ)। ইহাকে দিব্যমার্গও বলিয়া থাকেন। ইহা দ্বারাই অমৃতানন্দভোগ করা যায়। ইড়াতে চন্দ্র ও পিঙ্গলাতে সূর্য্য সঞ্চারণ করেন। যোগনিদানজ্ঞ সাধকবৃন্দ এক সুষুম্নানাড়ীতেও এই চন্দ্র-সূর্য্যের সঞ্চার জানিতে সমর্থ হন।

আগমজ্ঞ বুধগণ বলিয়া থাকেন যে, আধার পদ্মের মধ্যভাগে একটি অতি সুন্দর ত্রিকোণমণ্ডল বিদ্যমান আছে। এই ত্রিকোণমণ্ডল দিব্য জ্যোতিবিশিষ্ট।

ঐ ত্রিকোণে সকলের আত্মস্বরূপা বিদ্যুল্লতাকৃতি পরমদেবতা কুণ্ডলিনী প্রসুপ্ত ভুজগীর ন্যায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

এই কুণ্ডলিনী শক্তি হংস আশ্রয়পূর্ব্বক জীবাত্মাকে ধারণ করিতেছেন। হংসও প্রাণকে আশ্রয়পূর্ব্বক বিদ্যমান রহিয়াছেন। প্রাণও নাড়ীমার্গ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

সকল প্রাণীরই মূলাধার হইতে যথানিয়মে প্রাণবায়ু উত্থিত হইয়া সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া স্ব স্ব নাড়ীমার্গ দিয়া বহির্দ্দেশে গমন করে।

এই প্রাণবায়ু দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত। মনোহর কোমল বিশুদ্ধ আসনে বস্ত্র, মৃগচর্ম ও কুশ পাতিয়া তদুপরি যোগপযোগী আসন করিয়া উপবেশন করতঃ যোগী যোগ অভ্যাস করিবেন।



আরম্ভ সময়ে যথানিয়মে প্রাণবায়ু দ্বারা দেহ ভূতোদয় জানিয়া শরীর দৃঢ় করিবার জন্য দেহে ও তদ্‌ভূতের অর্চ্চনা করিবেন।

যোগের পদ্ধতি সদ্‌গুরুর মুখে শুনা উচিত, সেজন্য এ বিষয়ে আর লিখিলাম না। কুণ্ডলিনী শক্তির বিষয় জানাইবার জন্যই উপরোক্ত বিষয় লিখিলাম। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, ধ্যান করিবার পূর্ব্বে মনে মনে মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীকে জোরে জোরে আঘাত করিও, আর বলিও, 'মা জাগ, মা জাগ,'। যোগ ধীরে ধীরে অভ্যাস করিতে হয়। ভাবপ্রবণতা ধ্যানের কালে একেবারে দাবাইয়া দিতে হয়। ভাবপ্রবণতা থাকিলে কুণ্ডলিনী হঠাৎ নামিয়া যায়; তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয়।

—::—

## ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, 'ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা'; আমাদের এই বিশাল জগৎ তাহা ভ্রম, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। শ্রীশ্রীরামানুজ বলেন, তাহা ঠিক নহে। শ্রুতিতে জগৎ সৃষ্টির কথা আছে। শ্রুতি মিথ্যা হইতে পারে না। ঈশ্বরকে কোথাও কোথাও 'তুমি সৎ', 'তুমি পরমার্থ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। জগতের সব কিছুই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন আবার ব্রহ্মেই লীন হয়। জগৎ বিনাশশীল; সেইজন্য উহাকে নাস্তি বলা হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য বলেন, অবিদ্যা, অজ্ঞান বা মায়ার ফলে জগৎ আছে বলিয়া ভ্রম হয়। ইহা সৎ নহে, কারণ ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু; আবার ইহা আকাশ কুসুমের মত অসৎও নহে; ইহা

জ্ঞানের অভাব মাত্র নহে, ইহা ভাবরূপ বস্তু। জ্ঞানের অভাবকে অজ্ঞান বলা হয় না। অজ্ঞান বলিয়া একটি বস্তু আছে। ইহার স্বরূপ অনির্বচনীয়। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের প্রভাবে জীব বুঝিতে পারে না যে সে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই অজ্ঞান ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া রাখে।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈবনাপরঃ॥

রামানুজ এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, এমন কোনও বস্তুই থাকিতে পারে না যাহা 'সৎ'-ও নয় 'অসৎ'-ও নয়। প্রতি বস্তুই হয় 'সৎ' কিন্তু 'অসৎ'।

রামানুজ বলেন, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলই অবিদ্যা। এই অবিদ্যা হেতু জীব ব্রহ্মকে অনুভব করিতে পারে না। তাঁহার মতে মায়া ব্রহ্মের শক্তি এবং মায়া ও সত্য। শঙ্করের মতে মায়া ও অবিদ্যা একই। রামানুজের মতে মায়াও অবিদ্যা দুই পৃথক। শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। রামানুজ বলেন, জীব সকল পরস্পর বিভিন্ন এবং ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন। শঙ্করাচার্যের মতে, জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভূতি মাত্র, অর্থাৎ আত্মা জ্ঞাতা নহে, জ্ঞানস্বরূপ অনুভবিতা নহে, অনুভূতি মাত্র। রামানুজ বলেন, আত্মা জ্ঞাতা ও অনুভবিতা। জ্ঞাতৃত্ব আত্মার ধর্ম্ম। শঙ্করাচার্য্য বলেন, 'আমি বোধ' অহঙ্কারের ধর্ম্ম, ইহা মিথ্যা জ্ঞান; মোক্ষ অবস্থায় এই জ্ঞান থাকে না।

রামানুজের যুক্তি অন্য প্রকার,— তিনি বলেন, দেহতে অহং জ্ঞান অহংকারের ধর্ম্ম, কিন্তু আত্মাতে 'অহং জ্ঞান' ইহা সত্য জ্ঞান এবং মোক্ষ অবস্থাতেও এই জ্ঞান থাকে।



শঙ্করাচার্য্যের মতে, মোক্ষ হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। রামানুজ বলেন, মোক্ষ হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত এক হয় না। ব্রহ্মের দর্শন পায় এবং ব্রহ্মানন্দ লাভ করে। দুই জনের মতেই ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় শ্রুতিবাক্য শ্রবণ ও বিচার। রামানুজ বলেন, ব্রহ্মের উপাসনা। শঙ্করাচার্য্য বলেন, উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হইলে তাহাতে সহজে জ্ঞানের প্রকাশ পায়। কিন্তু জ্ঞানের উৎপত্তি হয় শ্রুতি বাক্য শ্রবণে। রামানুজ বলেন ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে শাস্ত্রে বিধান আছে। শাস্ত্র বাক্য শুনিয়া তাহার অর্থজ্ঞান হয়, কিন্তু অবিদ্যা নিবৃত্তি হয় না। ব্রহ্মকে জানিবে অর্থাৎ ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে। সেই উপাসনা তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিধারারূপ ধ্রুবাস্মৃতি। এই ধ্রুবাস্মৃতি এবং দর্শন একই বস্তু। ইহাকেই আবার ভক্তি বলা হয়। এই ভক্তির সাধন যজ্ঞাদি কর্ম্ম। শঙ্করাচার্য্যের মতে জ্ঞানের জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। যদিও এই দুই মতের মধ্যে পার্থক্য আছে, তাহা হইলেও, দুই মতই ঠিক ধরিয়া লওয়া উচিত। কারণ, এই দুই মতের পথিকদের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কাজেই এই দুই মতের যে কোনটির দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিই মত পার্থক্যের হেতু।

অদ্বৈতমতে জীব ও পরমাত্মা অভিন্ন, যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ; ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকল্প, নিরুপাধি, নির্গুণ; সুতরাং অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য অমেয়, মনোবুদ্ধির অগোচর।

বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্রহ্ম ও জীব স্বতন্ত্র বস্তু। ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী। জীব এক নহে, বহু, অনু পরিমাণ প্রতি শরীরে বিভিন্ন। জগৎ মিথ্যা নহে। প্রকৃত সত্ত্বা আছে, উহা ব্রহ্মের মায়াশক্তি-প্রসূত। জগৎ ব্রহ্মেরই শরীর; ব্রহ্মই শ্রুতিসিদ্ধ, ব্রহ্ম সগুণ, জগতের কর্ত্তা ও উপাদান।

শুদ্ধদ্বৈতবাদীমতে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ তিনই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক তত্ত্ব।

—*—

## অন্নময় ও প্রাণময় কোষ

অন্নরসের পরিণতিভূত স্থূল দেহই অন্নময় কোষ। ইহা জীবের বাহির আবরণ। ইহার অভ্যন্তরে পরবর্ত্তী আবরণই প্রাণময় কোষ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণ মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত হয়। এই কোষই প্রাণের বিকৃতিনিবন্ধন বক্তৃত্বহীন আত্মাকে বক্তা, দাতৃত্বহীন আত্মাকে দাতা, গমনাদিচেষ্ট-হীন আত্মাকে গতিশীল ও ক্ষুৎ-পিপাসাহীন আত্মাকে ক্ষুৎ-পিপাসা-যুক্ত করিয়া আবৃত রাখিয়াছে। এই প্রাণময় কোষকেই আশ্রিত করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ,দ্বেষাদি থাকে। ইহাই কামনার কোষ,—কামনার কোষ চায় ভোগের উত্তেজনার স্পন্দন, অন্নময় কোষ চায়-আলস্য।

প্রাণময় কোষটি পুরুষবিধ— পুরুষের দেহের ন্যায় হস্তমস্তকাদি সম্পন্ন। অন্নময় কোষ, আকৃতির অনুরূপ ইহার আকৃতি। বিশেষ এই যে প্রাণই প্রাণময় কোষের শির, ব্যানবায়ু তাহার দক্ষিণ পক্ষ, অপান-বায়ু বাম পক্ষ, আকাশ (অর্থাৎ সমান বায়ু) তাহার দেহ মধ্যভাগ এবং পৃথিবী তাহার স্থিতিসাধন পুচ্ছ। ইন্দ্রিয়গণ



প্রাণময় কোষের অনুগত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করে। জীবগণ প্রাণের অনুগত হইয়া জীবন ধারণ করে। এই প্রাণময়-কোষও অন্নময় কোষের দেহাধিষ্ঠিত।

—*—

## প্রাণায়াম

প্রাণায়াম অষ্টাঙ্গ যোগের চতুর্থ অঙ্গ। প্রাণবায়ুর গতিরোধই প্রাণায়াম। ইহার তিনটি অঙ্গ,—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। বাহিরের বায়ুকে ভিতরে প্রবেশ করান ও তাহাকে ভিতরে স্থির রাখাকে পূরক বলে। প্রাণবায়ুকে বাহির করা বা বাহির করিয়া সেইখানেই স্থির থাকাকে রেচন বলে। সদাগতি বায়ুকে স্থির করিয়া রাখিলেই গতিরোধ হয়। বায়ুকে স্থির করিলেই প্রাণায়াম সিদ্ধি হয়। ইহা আর অধিক লিখিলাম না, কারণ সদ্গুরুর উপদেশ ছাড়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে গেলে বিপদ হয়। ব্রহ্মচর্য্য না হইলে প্রাণায়াম করা উচিত নয়।

—*—

## প্রারব্ধ (২)

প্রারব্ধ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও লিখিয়াছি। কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। সকাম কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। পূর্ণজ্ঞান হইবার পরও কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। পূর্ব্বজন্মের অর্জ্জিত সংস্কারই প্রারব্ধ, যার ভোগ এখনও বাকী আছে।

ব্রহ্মময়ী মায়ের কৃপায় প্রারব্ধনাশ নানাভাবে সম্ভব হয়। কিন্তু ভোগ দ্বারাই ইহার নাশ অন্য কোনও উপায়ে নয়। কতক প্রত্যক্ষ ভোগের দ্বারা, কতক সংযমের ভিতর দিয়া, আবার কতক

স্বপ্নের ভিতর দিয়া। তবে সবই ভোগের দ্বারাই। ধৈর্যের সহিত প্রারব্ধ ভোগ করা উচিত; বাধা দিতে নাই। বাধা দিলে ভোগ কাটে না।

—*—

## জীবাবর্ত্ত

ঘূর্ণির মত জীবের পুনঃ পুনঃ গতা-গতিই জীবাবর্ত্ত। সৃষ্টি অনাদি হইলেও, প্রলয়ের পরে অতি সূক্ষ্মভাবে পুনঃ সৃষ্টি আরম্ভ হয়। বিভিন্ন তত্ত্বের বিভিন্ন মাত্রায় মিশ্রণের ফলেই এই বিচিত্র সৃষ্টি।

শাস্ত্রে আছে, স্থাবর যোনিতে (বৃক্ষাদিতে) বিশ লক্ষ, জলজ-যোনিতে (মৎস্যাদি) নয় লক্ষ, ক্রিমিযোনিতে এগার লক্ষ, পক্ষী যোনিতে দশ লক্ষ, পশ্বাদি যোনিতে ত্রিশ লক্ষ, বানর যোনিতে চার লক্ষ —এইভাবে চুরাশী লক্ষ যোনিতে অতিক্রম করিয়া মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। প্রথমে কুৎসিতাদি মনুষ্যকুলে দুই লক্ষ জন্মের পর উৎকৃষ্ট জন্মলাভ করে। উৎকৃষ্ট জন্মলাভ মানুষের কৃতকর্ম্মের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। জীবাবর্ত্ত এইভাবেই চলিতে থাকে। মানুষ সংসারে আসিয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও অধিদৈবিক এই তিন রকম তাপ ভোগ করে। কিন্তু জ্ঞান অর্জ্জন করিলে তাহার বৈরাগ্য জন্মায়—বিষয় ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মে। তখনই অন্তরের সন্ধান করে, আর আত্মা তাহাতে লীন হয়।

ভাগবতে আছে— শ্রীভগবান্ সব সৃষ্টির পর মানুষ সৃষ্টি করিয়াই আনন্দ পাইলেন এবং মানুষকে আনন্দ উপভোগের সামর্থ দিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই আশীর্ব্বাদের ফলেই আর্য্য ঋষিগণ জগৎ রহস্য অবগত হইয়া, যে আনন্দ লাভ



করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের উপভোগের জন্য শাস্ত্রাদি গ্রন্থে সেই সকল লাভের পদ্ধতি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

—●—

## জ্ঞান

জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে গীতার ১৩।৮।১২ পাঠ করুন। শ্রীজগদীশ ঘোষের প্রণীত গীতা আমার বেশ ভাল লাগে। জাগ্রত অবস্থার জ্ঞান ও স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান একই প্রকার। সুষুপ্তিতে জ্ঞান থাকে না, উহা জ্ঞানশূন্য অবস্থা।

প্রকৃত জ্ঞান পারমার্থিক জ্ঞান। ঈশ্বর সৎ আর সমস্তই অসৎ, এইটি জানাই প্রকৃত জ্ঞান। আমি আর পরমব্রহ্ম একই, ইহা মায়ার দরুণ জানিতে দেয় না। স্বস্বরূপকে জানা এবং তাহা ধরিয়া রাখাই জ্ঞান। "নেতি নেতি" করিয়া আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান।

কুণ্ডলিনী যতদিন জাগ্রত না হয় ততদিন জ্ঞান হয় না।

=●=

## গুরুশিষ্য প্রসঙ্গ

তন্ত্রে গুরু সম্বন্ধে সব কিছুই বিশদভাবে দেওয়া আছে। সদগুরুর লক্ষণ কি? তিনি পবিত্র স্বভাব, সুপ্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বগুণান্বিত। যিনি শান্ত দান্ত সুপুরুষ শিষ্যের প্রতি শাসনে ও অনুগ্রহে সমর্থ, তিনিই গুরুপদের যোগ্য।

গুরুই পিতা, মাতা, দেবতা ও একমাত্র গতি। তিনি জ্ঞানদাতা দুঃখময় সংসার সাগরে গুরু অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নাই।

যে ব্যক্তি পুণ্যবান, ধার্ম্মিক, শুদ্ধচিত্ত, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয় ও দানধ্যানপরায়ণ, তাদৃশ ব্যক্তিই শিষ্যের উপযুক্ত।

সদ্‌গুরু উপযুক্ত শিষ্যকে মন্ত্রদান করিয়া দীক্ষিত করেন। গুরুদত্ত মন্ত্র, দেবতা ও গুরু এই তিনকে একই জ্ঞান করা উচিত। বিনা দীক্ষায় মন্ত্রজপ দূষিত হয়। তবে তাহাতে কোন কুফল হয় না, বরং সুফলই হইয়া থাকে। যেহেতু দিব্যজ্ঞান-লাভ ও পাপ-ক্ষয় হয়, এইজন্য মুনিগণ 'দীক্ষা' এই নামকরণ করিয়াছেন। সকল আশ্রমেই দীক্ষার প্রয়োজন আছে। শাস্ত্রেই আছে, দীক্ষাই জপ, তপ প্রভৃতি কার্য্যের মূল; যে কোন আশ্রমেই বাস করা হউক, দীক্ষার আশ্রয় লইতেই হইবে। শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন, 'দীক্ষাহীন ব্যক্তির সিদ্ধি বা সদগতি লাভ হয় না, অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইবে।' 'অদীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা, নিয়ম, ব্রত, তীর্থগমন এবং শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না।

দীক্ষিত হইলে গুরু শিষ্যের মধ্যে এক পারমার্থিক গভীর সম্বন্ধ জন্মায়। শিষ্য যতই গুরুকে চিন্তা করে সে ততই তাঁহার সঞ্চিত তেজঃ বা তপস্যার ফলপ্রাপ্ত হয় ও উত্থিত হয়। ফলে গুরুকে নামিতে হয়। গুরু যদি মহাব্যোমে উঠিতে থাকেন আর শিষ্য যদি তাঁহাকে ডাকে বা ভাবনা করে তাহা হইলে তখনই গুরুকে বাধ্য হইয়া মহাব্যোম হইতে নামিয়া আসিতে হয়। একথা লিখিয়াছেন শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁহার 'সাধু দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গে'। তাই মনুষ্যধারী গুরুবর্গ সাধারণতঃ নিজের রূপের চিন্তা করিতে দেন না। আসল কথা গুরু জীবিত থাকিলে শিষ্যের পক্ষে তাঁহাকে চিন্তা করা উচিত। তাহার ফলে সে গুরুর শক্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু গুরু বিদেহ হইলে শিষ্যের পক্ষে গুরুর মূর্ত্তি চিন্তা করা উচিত নহে। কারণ তাহার ফলে গুরুকে আকর্ষণ করিয়া



তাঁহার হানি করা হয়। অবশ্য ইহা একদিকের কথা। ইহার অন্য-দিকও আছে। গুরু নরদেহে অধিষ্ঠিত থাকিলে, তাঁহাকে সাক্ষাৎ শিব মূর্ত্তিতে চিন্তা করা উচিত, পূর্ব্ব পরিচিত নর মূর্ত্তিতে নহে। গুরুর দেহাবস্থান কালে শিব মূর্ত্তিতে গুরুকে চিন্তা করা ভাল নয়। তাহা শিষ্যের অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন; ঐ নররূপী গুরু মূর্ত্তিতে যখন পরব্রহ্ম বিরাজমান, তখন ঐ মূর্ত্তির পরিহার নিরর্থক।

গুরু সম্বন্ধে যদি বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬।১৪।২ দেখিতে পারেন। 'বৃহৎতন্ত্রসারের' প্রথমেই এ সম্বন্ধে অনেক কিছুই পাইবেন।

—::—

## সপ্তভূমি ও ষট্‌চক্র

এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু লিখিয়াছি, বেদান্তের সপ্তভূমি ও যোগ-শাস্ত্রের ষট্‌চক্র, বেদের তিনভূমি আর যোগশাস্ত্রের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর যথাক্রমে গুহ্য, লিঙ্গ ও নাভিতে মনের বাস। মন যখন চতুর্থ ভূমিতে উঠে অর্থাৎ অনাহত পদ্মে, তখন জীবাত্মাকে শিখার ন্যায় দর্শন হয় আর জ্যোতি দর্শন হয়। পঞ্চম ভূমিতে মন উঠিলে কেবল ঈশ্বরের কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই বিশুদ্ধ চক্র। ষষ্ঠভূমি আর আজ্ঞা চক্র এক। সেখানে মন যাইলে ঈশ্বর দর্শন হয়। ইহার পরই সপ্তমভূমি। এখানে মন যাইলে মনের লয় হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হইয়া যায়। ইহাই সমাধি অবস্থা।

আমাদের শরীর একটি অদ্ভুত যন্ত্রবিশেষ। মন একটি শক্তিশালী যোগসূত্র। শরীরের যে কোনও অংশে যদি মনকে একভাবে রাখা যায়, তাহা হইলে সেই স্থান কার্য্যকরী হইয়া উঠে। শরীরের মধ্যে

কয়েকটি বিশেষ স্থান আছে, সেগুলি বিশেষ শক্তিশালী, কিন্তু সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সেইগুলিই ঐ উপরোক্ত সপ্তভূমি।

—*—

## সৃষ্টিতে নিয়ম

ভগবানের সৃষ্টির যাহা কিছু সবই নিয়মের বশবর্ত্তী। কোথাও কোনও অনিয়ম কখনও হয় নাই বা হইবে না। ভগবান তাঁহার নিয়মগুলি কখনও পরিবর্ত্তন করেন না বা করিবার কোনও প্রয়োজন হয় নাই। সব কিছুই বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাধিত হইতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝিবে যে সবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়ম মোতাবেক চলিতেছে। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ঠিক নিয়মিত হইতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া হইতে থাকিবে। নিম্নতর জীব হইতে পশু, পশু হইতে ক্রমবিকাশে মানুষ হইবে, ক্রমে বিবেক পরিপক্ক হইবে। যতদিন জীবাত্মার মুক্তি না হয় ততদিন জন্মান্তর হইতে হইবে। জন্মের কারণ থাকিবে, মৃত্যুরও কারণ থাকিবে। কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। প্রকৃতিতে দৈনন্দিন যাহা হইতেছে সবই নিয়ম মোতাবেক। অলৌকিক বলিয়া যাহা বর্ণনা করা হয় তাহার কারণ আমাদের জানা নাই, তাই বলি অলৌকিক। নানা পুস্তকে এবং সাধু মহাত্মাদের জীবনীতে নানারকম অলৌকিক ঘটনার কথা লেখা হয়। সবই শোনা কথা। উহা বিশ্বাস করা উচিত নয়। যাঁহারা সাধু মহাত্মাদের সম্বন্ধে ঐ সকল কথা বলেন বা লেখেন তাঁহারা সেই সাধু মহাত্মাদের প্রতি অশ্রদ্ধাই দেখান।

আমাদের মন অত্যন্ত প্রবল, এবং ইহার দেহ না থাকায় অতি সূক্ষ্ম এবং সর্ব্বত্রই প্রবেশ করিতে পারে। মনকে অভ্যাস দ্বারা নানা কাজে লাগাইতে পারা যায়। এই মন অন্যের মনের উপরও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। ইহা অলৌকিক কিছু নহে। আমরা যে সকল বিভূতির কথা শুনিয়া থাকি, তাহার বেশীর ভাগই মিথ্যা। যেগুলি সত্যই ঘটিয়াছে, সেগুলি এই মনেরই কাজ।



মৃত্যুর পর জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহের সহিত অবস্থান করে। নূতন স্থূল দেহ পাইবার জন্য অপেক্ষা করে। আমাদের প্রবল মন সেই সূক্ষ্মদেহের উপরও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এ সবই বৈজ্ঞানিক। আমাদের জীবনে যাহা কিছু ঘটিয়া থাকে, ভাল-মন্দ সবই আমাদের কর্ম্মফল। ইহাও বৈজ্ঞানিক, প্রতিটি action এর reaction. অনেক সাধু মহাত্মা, আমাদের দুঃখ কষ্ট লাঘব করিবার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত সাময়িক। তাহাতে re-action পিছাইয়া যায় মাত্র কিংবা re-action অন্যরূপে দেখা দেয়।

মনকে অভ্যাস দ্বারা সুখ-দুঃখ হইতে নির্বিকার করা যায়। মনকে কি প্রকারে একাগ্র করা যায়; তাহা সদ্‌গুরু শিষ্যকে শিখাইয়া দেন— তাহাই 'গুরুকৃপা'। সুখের সময় সুখ ভোগ করিলে দুঃখ আসিবেই। সেই দুঃখ বিনা বাধায় ভোগ করিলে, শীঘ্রই তাহার নিবৃত্তি হইয়া যায়। দুঃখ ভোগ এড়াইবার চেষ্টা করিলে, ভোগের সময় বাড়িয়া যায় মাত্র। ভগবান্ কিছুই করেন না। তিনি নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন, সেই নিয়মেই সব চলিতেছে। সুখের পথ, দুঃখের পথ, স্বর্গপ্রাপ্তির পথ, মুক্তির পথ সবই বাঁধা আছে। নূতন কখনও কিছু হয় নাই, হইবেও না। এই অনন্তে একই নিয়ম চলিতেছে, তাহার আদি নাই, অন্ত

নাই। জন্ম হইলে মৃত্যু হইবেই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সময়টুকু কাটে সুখ-দুঃখে। সুখ পাইবার জন্য ও দুঃখ এড়াইবার জন্য আমরা নানা কর্ম্ম করিয়া থাকি। এই কর্ম্মগুলি যদি শাস্ত্রীয় মতে করিয়া থাকি তাহা হইলেই আত্মার উন্নতি হয়। অন্যথায় নূতন কর্ম্ম করিয়া ফেলি যাহার জন্যই পুনর্জ্জন্ম। আবার দুঃখ-কষ্ট চলিতে থাকে। কাজেই আমাদের শ্রেয় হইতেছে, যাহাতে নূতন কর্ম্ম না করি, যাহাতে পুনর্জ্জন্ম না হয়। সেইজন্যই নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ এবং সাধনার প্রয়োজনীয়তা। দেহ থাকিতে কর্ম্মশূন্য হওয়া যায় না। আমরা স্বভাবের বশেই কর্ম্ম করি। অভ্যাসের দ্বারা আমরা আমাদের স্বভাব বদলাইতে পারি এবং কর্ম্মকে নিষ্কাম করিতে পারি।

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করা উচিত ঈশ্বর-দর্শন। দুঃখ আসিলে অসহায় না হইয়া চোখের জল ফেলিয়া দুঃখ সহ্য করা উচিত। সব সময় মনে রাখা দরকার যে, সব দুঃখই আমাদের কৃতকর্ম্মের ফল। কোন্ দুঃখ কোন্ কর্ম্মের ফলে আসিতেছে তাহা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই দুঃখের সময় ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করা উচিত,— প্রভু এরূপ কর্ম্ম যাহাতে না করি যাহাতে দুঃখ ভোগ হয়। শরীর থাকিলে রোগ জ্বালা হইবেই। ভগবান্ তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। সব সময় মনে রাখা দরকার যে, আমি একা আসিয়াছি, একাই যাইব। পুত্র, কন্যা পরিবারবর্গের সহিত সম্বন্ধ এই জীবনেই। পূর্ব্বজন্মে তাহাদের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ ছিল না, আমার মৃত্যুর পর তাহাদের সহিত কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফল লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং কর্ম্মফল ভোগ করে।



আমরা অযথা পুত্র-কন্যা পরিবারবর্গের সুখ-দুঃখে নিজেদের জড়াইয়া অশান্তি ভোগ করি। আশ্চর্য্য কথা আমরা সব বুঝিয়াও বুঝি না। ইহাই 'মায়া'। ভগবান্ সর্ব্বদাই কৃপা বর্ষণ করিতেছেন। সেই কৃপা ধরিবার জন্য উপযুক্ত পাত্র আমাদের সংগ্রহ করিতে হইবে। সেই উপযুক্ত পাত্র সংগ্রহের উপায়ও ভগবান্ জানাইয়া দিয়াছেন— সবই নিয়মমতে ঠিক।

—*—

## সংসারী ও অধ্যাত্ম জগৎ

অনেকের ধারণা সংসারীর পক্ষে অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ অসম্ভব। ইহা সত্য নহে। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বহু বার বলিয়াছেন। আমরা যদি পুরাণগুলি ঘাঁটিয়া দেখি, তাহা হইলে পাইব যে বেশীর ভাগ মুনি-ঋষিই বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তানাদিও ছিল। এই প্রভেদ যে তাঁহারা তাঁহাদের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে অধ্যাত্ম চিন্তায় ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। কর্ম্ম ছিল তাঁহাদের নিষ্কাম। তাঁহারা থাকিতেন বনে-জঙ্গলে, আশ্রমে। তাঁহাদেরও আহারের চিন্তা করিতে হইত। তাঁহারা স্ত্রীসঙ্গ করিতেন, এমন কি পরস্ত্রী সঙ্গও করিতেন, তখনকার প্রথা অনুসারে। তাঁহাদের স্ত্রী জাতির প্রতি আসক্তি হয়তো কম ছিল, কিন্তু ছিল, তাহার প্রমাণ অনেক আছে। ব্যাসদেবের জন্মই ইহার একটি বড় প্রমাণ। রাজা মহারাজাদের পুত্র-সন্তান না হইলে, মুনি-ঋষিদের ঔরষে সন্তান জন্মান একটা প্রচলিত প্রথাই ছিল। কাজেই সংসারী বিবাহ করিয়াছেন, স্ত্রীসঙ্গ করেন, সেজন্য হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই। একমাত্র কাম-কামিনী ত্যাগ করিলেই অধ্যাত্ম জগতে

উন্নতি করা যায় না। আমরা যে সকল সাধু সন্ন্যাসী সহরে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখি, তাহার বেশীর ভাগই, বিহার, উত্তর প্রদেশ কিংবা মধ্য প্রদেশের। তাহারা বেশীর ভাগই সংসারী। নিজেদের চাষ আবাদ শেষ করিয়া তাহারা গৈরিক বসন পরিয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া পড়ে; এদেশ ওদেশ ঘুরিয়া কিছু রোজগার করিয়া লয়। তাহাদের বেশীর ভাগের অধ্যাত্ম জগতের সহিত সম্বন্ধ গঞ্জিকা সেবন মাত্র। যদি শতকরা হিসাব লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে সন্ন্যাসী বেশধারী অপেক্ষা সংসারীর মধ্যে ভগবৎ ভক্ত অনেক বেশী। প্রায় প্রতিটি সংসারীই ভগবৎ ভক্ত, কেও কম, কেও বেশী। অভক্তদের সংখ্যা খুবই কম। আমাদের দেশে চোর-ডাকাতও ভগবৎ ভক্ত। মহাপাপীও ভগবানে বিশ্বাস করে। ভারত ছাড়া এ জিনিষ আর কোথাও নাই। বিবাহ না করার প্রথা আরম্ভ হইয়াছে বৌদ্ধ যুগ হইতে, বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের রেওয়াজ অনুসারে। শঙ্করাচার্যের পূর্ব্বে এত সন্ন্যাসী দলের নাম শুনা যায় না। তিনিই প্রথম নানা গোষ্ঠীর সন্ন্যাসী সৃষ্টি করিলেন। সেইগুলিই এখন ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। যাঁহারা কুম্ভমেলা গিয়াছেন, তাঁহারা জানেন এই সকল সাধুর সংখ্যা কিরূপ। পাহাড় পর্ব্বতে থাকিয়া যোগ সাধনা করা সাধক সন্ন্যাসী আজকাল অত্যন্ত বিরল। পুরাকালে যাঁহারা কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হইতেন তাঁহাদিগকে মুনি, ঋষি, যতি ইত্যাদি বলা হইত। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও লিখিয়াছি। পুরাকালের তপস্বীদের বিষয় জানিতে হইলে তৈত্তিরীয় আরণ্যক, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ অথর্ববেদ (৭।১৪।১) পড়িতে পারেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কথা আছে।



সংসারীরা যদি সকল কাজকর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বর চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি নিশ্চয়ই হইবে। ভগবান তাহাদের নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা করিয়া দেন।

আজকাল গুরুগিরি একটা প্রতারণার ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের দুঃখ কষ্টের সুবিধা লইয়া এক জাতির লোক গুরু সাজিয়া আশ্রম খুলিয়া বসেন ও শিষ্যদের দোহন করিতে থাকেন। যাহার কাছে যত দোহন করিতে পারেন সেই হয় তত বড় ভক্ত ও প্রিয় শিষ্য। এইভাবে বহু আশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐরূপ প্রতারকেরা শিষ্যের অর্থে প্রচুর ধনী হইয়া বিলাসিতার সহিত জীবন যাপন করেন। যাঁহারা গুরুকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেন, তাঁহাদের সেই অর্থ অন্যায় উপায়ে অর্জ্জিত হইয়া থাকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। অনেক ক্ষেত্রে গুরুরা ভয় দেখাইয়া শিষ্যের নিকট হইতে টাকা-কড়ি, সম্পত্তি আদায় করেন। একবার এইরূপ গুরুর কবলে পড়িলে বাহির হইয়া আসাও কঠিন হইয়া পড়ে। সাবধান! যে মুহূর্ত্তে গুরু শিষ্যের নিকট টাকার কথা তুলিবেন, সেই মুহূর্ত্তেই শিষ্যকে গুরুর নিকট হইতে পলায়ন করা উচিত। গুরু-দীক্ষা না হয় তাহাও ভাল, কিন্তু যে গুরু টাকা চায় সে গুরুর ধারে পাশে যাওয়া উচিত নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,— "যিনি এ সংসারে মায়ার পারে লইয়া যান, যিনি কৃপা করিয়া সমস্ত মানসিক আদিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই গুরু। একটি জীবের ব্রহ্মবিকাশ হইলে হাজার হাজার লোক সেই আলোকে পথ পাইয়া অগ্রসর হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরাই একমাত্র লোকগুরু। এ কথা সর্ব্বশাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়। অবৈদিক, অশাস্ত্রীয় কুলগুরু প্রথা স্বার্থপর

ব্রাহ্মণরাই এদেশে প্রচলন করিয়াছে। সেইজন্যই আজকাল সাধন করিয়াও সিদ্ধ ও ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারে না।

শাস্ত্রে বলে যাঁহারা অধীত বেদবেদান্ত, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁহারা অপরকে অভয়ের পারে লইতে সমর্থ, তাঁহারাই যথার্থ গুরু। তাঁহাদের পাইলেই দীক্ষিত হইবে ; নাত্র কার্য্যবিরচনা। আজকাল দাঁড়াইয়াছে, "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।"

গুরুর কর্ত্তব্য শিষ্যকে অধ্যাত্ম জগতের উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া। ইহা ছাড়া গুরুর সহিত শিষ্যের আর অন্য কোনও সম্বন্ধ নাই।

সংসারে সুখ-দুঃখ দুইই আছে ; রোগ জ্বালাও আছে। এই সবের মধ্যেও সংসারীর নিত্যনৈমিত্তিক পূজা পাঠ করা বিশেষ প্রয়োজন।

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই ভগবৎ দর্শন, তাহা সংসারে থাকিয়াই হউক বা সন্ন্যাসী হইয়াই হউক। সংসারে থাকিয়া যাঁহারা ভোগ কমাইয়া ঈশ্বরে শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। ঈশ্বর তাঁহাদের সব সুবিধা করিয়া দেন। সৃষ্টি ভগবানের— জীব দ্বারাই ভগবান সৃষ্টিরক্ষা ও বর্দ্ধিত করেন। সংসারীর অধ্যাত্মজগৎ হইতে পদস্খলন হইলে, সে সংসারে পতিত হয় এবং সামলাইয়া লইয়া সুপথে চলিবার সুযোগ পায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, কেল্লার ভিতর হইতে লড়াই করা। যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহাদের পথ অতি কঠিন— তাহাদের পদস্খলন হইলে, অগাধ জলেই পতিত হন। সংসার তো গিয়াছে, সন্ন্যাসও কোথায় মিলাইয়া যায়। তাঁহারা নিতান্ত হতভাগ্য। গরুড়-পুরাণে আছে, লোভশূন্য গৃহীর গৃহই তপোবন স্বরূপ।



মহাভারতে আছে,— 'নান্যদাগচ্ছতে যস্তু ব্রহ্মচর্য্যস্তু তৎ স্মৃতম্।' সংসারীর পক্ষে অবিহিতকালে স্ত্রী সম্ভোগে নিবৃত্ত থাকাই 'ব্রহ্মচর্য্য'। কাজেই সংসারীর পক্ষে যোগ-সাধনা বা ধ্যানের কোনও বাধাই নাই।

চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ ধ্যানের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। গীতায় আছে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ করা সম্ভব। এখানে বৈরাগ্যের অর্থ সন্ন্যাস গ্রহণ নহে। বিষয়ে অনাসক্তি ও সংযমই সংসারীর বৈরাগ্য।

—::—

## বৈষ্ণব সম্প্রদায়

বৈষ্ণব সাধনায় ভগবানের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক। ভালবাসা ভালবাসার জন্য, অন্য কিছুর জন্য নহে। চৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন, 'প্রেমাপুমর্থোমহান্'। মহাপ্রভুর পূর্ব্বে যে সকল বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আচার্য্য রামানুজ, আচার্য্য মধ্ব, আনন্দতীর্থ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত "শ্রীমাধ্বরুদ্র সনকাঃ" চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রাক্-চৈতন্য যুগের। তারও আগের সত্বত, ভাগবত, একান্তী, পাঞ্চরাত্র, চতুঃসন প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রৌতধর্ম্ম। সাধারণতঃ তিনটি প্রস্থানের কথা বলা হয়, যথা—শ্রুতি বা উপনিষদ্, স্মৃতি বা গীতা, ন্যায় অর্থাৎ বেদান্ত। বৈষ্ণবেরা করিলেন, 'রসপ্রস্থান'। কৃষ্ণপ্রেমই একমাত্র ধর্ম্ম, তাহার অধিক আর কিছুই নাই। বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে পরে আবার লিখিব।

## বিভূতি

অষ্ট বিভূতি—অষ্ট প্রকার যোগলব্ধ ঐশ্বর্য, অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং কামাবসায়িতা।

—●—

## পাশ

অষ্টপাশ=ঘৃণালজ্জা ভয়শঙ্কা জুগুপ্‌সা, চেতী পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥
কুলার্ণবতন্ত্র।

অষ্টনায়িকা= মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী, কৌমারী।

পঞ্চবট=অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক ও আমলকী।

অষ্টনাগ=বাসুকী, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, ফুলীর, কর্কট, শঙ্ক।

—::—

## 'দান'

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,— কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম, তন্মধ্যে আবার ধর্ম্মদান শ্রেষ্ঠ দান, বিদ্যাদান তাহার নিম্নে, তারপর প্রাণদান; সর্ব্ব নিকৃষ্ট দান অন্নদান।

প্রাণদান সম্বন্ধে গরুড় পুরাণে আছে,—পরের উপকারে মৃত্যু দুঃসহ দুঃখকর।

দাতা দরিদ্র কৃপণোঽর্থযুক্তঃ।
পুত্রোঽবিধেয়ঃ কুজনস্য সেবা।
পরোপকারেষু নরস্য মৃত্যুঃ।
প্রজায়তে দুশ্চরিতানি পঞ্চ ॥

—*—



## বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও রাসপঞ্চাধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগতের রাসপঞ্চাধ্যায় বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ। সংক্ষেপে রাসপঞ্চাধ্যায় দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু লিখিব।

মল্লিকা-কুসুম-শোভিত শরতের জ্যোৎস্না-স্নাত রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াশ্রয়ে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়া, এক সুরম্য বনস্থলীতে গিয়া রমণীগণের মনোহরণকারী অব্যক্তমধুর গীতধ্বনি করিলেন। ব্রজস্ত্রীগণ সেই কামবর্দ্ধক গীত শুনিবামাত্র ছুটিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। যাহারা আসিতে অক্ষম হইলেন, তাঁহারা কৃষ্ণগতচিত্তে ধ্যানস্থা হইয়া তনুত্যাগ করিলেন, এবং চিন্ময়দেহধারী শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গে তাঁহারা মিলিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিলেন, তোমাদের আগমনের কারণ বল এবং আমি তোমাদের কি করিব বল। রজনী অতি ঘোরা, অরণ্যেও হিংস্র প্রাণিগণের বাস। তোমরা স্ত্রীজাতি, বন্ধুগণ তোমাদের অন্বেষণ করিতেছেন। ব্রজে ফিরিয়া যাও। পতি-পুত্রগণের সেবাই স্ত্রীধর্ম্ম। অন্য সকল জীবের ন্যায় তোমরাও যে আমাকে প্রীতি কর তাহা সমুচিত বটে, কিন্তু পতি যেমনই হউক, স্ত্রী কখনও ত্যাগ করে না। গোপীগণ বলিলেন, আমরা সকলই ছাড়িয়া আসিয়াছি, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। তুমি দেহীগণের আত্মা ও বন্ধু, তুমিই সকল পতিপুত্রাদির অধিষ্ঠানস্থল। অধরামৃতসেক দ্বারা আমাদের হৃদয়াগ্নি নির্ব্বাপিত কর। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই গোপীগণের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। কটাক্ষনিক্ষেপ, নানাঙ্গস্পর্শ ও হাস্য-পরিহাস দ্বারা গোপীগণের ভাবসমূহ উদ্দীপিত করিয়া তিনি ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ইহাতে ব্রজরমণীরা অত্যন্ত অভিমানিনী হইয়া আপনাদিগকে পৃথিবীর যাবতীয় রমণীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন সহসা অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ তাঁহাতে আবিষ্টা

হইয়া প্রত্যেকে 'আমিই কৃষ্ণ' 'আমিই কৃষ্ণ' বলিয়া তাঁহারই কার্য্যের অনুকরণ করিতে লাগিল। সকলে মিলিয়া কখনও কৃষ্ণ গান করিতে করিতে, কখনও রোদন করিতে করিতে, তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। বৃক্ষ, লতা, পশু-পক্ষীদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, যদি তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান দিতে পারে।

এইরূপে বনমধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন ও তাহার সহিত অপর এক পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়া ভাবিতে লাগিল যে, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই কোনও রমণীকে একক নির্জ্জনে লইয়া গিয়াছেন এবং সেই চতুরা রমণী তাঁহার অধরসুধা পান করিতেছে। অপরদিকে সেই রমণী ভাবিতে লাগিল, সেই বুঝি সেই গোপীকুলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রমণী। সে গর্ব্বিতা হইয়া বলিল, আমি আর চলিতে পারিতেছি না; তোমার যেখানে ইচ্ছা আমায় লইয়া যাও। তখন সহসা শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। সেই রমণী তখন অত্যন্ত সন্তপ্তা হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন সব গোপিনীগণ একত্রে মিলিয়া কৃষ্ণদর্শন লালসায় নানাভাবের গান ও বিলাপ করিতে লাগিল এবং অবশেষে অতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন পীতবসন ও মাল্যভূষিত মদনমোহন শৌরি মৃদুহাস্যশোভিত মুখকমল লইয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন।

"তাসামাবির ভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥
১০।৩২।২



প্রিয়তম দেখিয়া গোপীগণ যুগপৎ গাত্রোত্থান করিয়া কেহ তাঁহার হাত ধরিল, কেহ তাঁহার হাত নিজ স্কন্ধে রাখিল, কেহ তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বুল হাত পাতিয়া লইল, কেহ তাঁহার চরণযুগল টানিয়া নিজ কুচযুগের উপর স্থাপন করিল। এইরূপে তাঁহাকে লইয়া আনন্দে বিভোর হইল। গোপীকুলশোভিত শ্রীকৃষ্ণ তখন যমুনা-পুলিনে প্রবেশ করিলেন। গোপীগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "যে ভজনা পাইবার জন্য অন্যের ভজনা করে, সে নিজেই উপাসনা করে, তাহাতে ধর্ম্ম বা সৌহৃদ্য কোনটাই লাভ হয় না। পিতামাতা যেরূপ ভজনবিমুখ সন্তানকেও অকপটভাবে প্রতিপালন করেন, সেইরূপ ভজনা না পাইয়াও যে ভজনা করে, সেই প্রকৃত ধর্ম্ম ও সৌহৃদ্য উভয়কে লাভ করে। যে কাহারও ভজনা করে না সে হয় আপ্তকাম, না হয় অকৃতজ্ঞ। লব্ধ ধন নষ্ট হইলে নির্ধন যেমন সেই নষ্ট ধনের কথাই ভাবে, আর কিছুই ভাবিতে পারে না, আমার ভক্তও সেইরূপ আমাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। ভক্তগণকে ধ্যানে প্রবৃত্ত করার জন্যই আমি তাহাদের ভজনা করিতে বিলম্ব করি। আমার অদর্শন হেতু তোমরা আমার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইবে, সেইজন্যই আমি পরোক্ষে থাকিয়া তোমাদের প্রেমালাপ শুনিতেছিলাম।"

শ্রীভগবানের এইরূপ মনোমোহন বাক্য শুনিয়া এবং তাঁহার অঙ্গসেবায় সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া গোপীগণ বিরহজনিত সকল তাপ পরিত্যাগ করিল। সেই স্ত্রীগণ প্রীতা হইয়া পরস্পর বাহুবন্ধনে মিলিতা হইল। শ্রীকৃষ্ণ তখন সুমধুর রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।

গোপীগণ নানা নৃত্যভঙ্গীজনিত চঞ্চল কুচবস্ত্র, শিথিল-কবরী-মেখলা ও বিন্দু বিন্দু স্বেদমুখী হইয়া নৃত্য-গীত করিতে করিতে চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বিহারশ্রান্তা বিস্রস্তাভরণা গোপিনীগণের মুখমণ্ডল নিজ হস্তে মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। তারপর জলক্রীড়ার্থ তিনি রমণীগণকে লইয়া জলে প্রবেশ করিলেন। গোপীগণ চতুর্দ্দিক হইতে শ্রীকৃষ্ণকে জলসিক্ত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শরৎযামিনীর সৌন্দর্য্য সেই অনুরক্তা গোপীগণসহ উপভোগ করিয়াছিলেন।"

এই রাসপঞ্চাধ্যায় শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মস্থাপন ও অধর্ম্ম প্রশমন জন্য ঈশ্বরের অংশাবতার, স্বয়ং আপ্তকাম হইয়াও কোন্ অভিপ্রায়ে তিনি পরদার স্পর্শরূপ এই বিপরীত আচরণের অনুষ্ঠান করিলেন?

ইহার উত্তরে শুকদেব বলিয়াছিলেন, 'শক্তিমানগণের আচরণে কখনও কখনও লোকধর্ম্মের ব্যতিক্রম ও অসাধারণ সাহস দেখা যায়। বহ্নি যেমন ভালমন্দ সকলই গ্রাস করে, কিন্তু কিছুর দ্বারাই কলুষিত হয় না, তেজীয়ান্‌ও তেমনি ঐরূপ আচরণের জন্য বিন্দুমাত্র দূষিত হন না। কিন্তু দুর্ব্বলেরা এইরূপ আচরণকে মনেও স্থান দিবে না, তাহা হইলে মূঢ়তাবশতঃ বিনাশ পাইবে।

মহাদেব সমুদ্রমন্থনজাত বিষ পান করিয়াছিলেন, অন্যে কেহ কি তাহা পারিত? শক্তিমানদের বাক্য সত্য, যে আচরণ তাঁহাদের বাক্যের অবিরোধী, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাই অনুসরণ করিবে।

লোকানুগ্রহার্থ স্বয়ং ভগবান্ এই লীলা করিয়া গিয়াছেন, যেন এই সকল লীলাকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি মানুষের দৃঢ়মতি হয়। এই সকল লীলাকথা শ্রবণ করিলে সমস্ত হৃদ্‌রোগের ধ্বংস হয়।



কিন্তু ব্রহ্ম সংহিতায় বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, অপ্রকট গোলকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের যে ভাব তাহা স্বকীয়া ভাব।

"আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি
স্তাভি য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ
গোলক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, আদি পুরুষ অখিলাত্মভূত গোবিন্দ স্বীয় প্রেয়সীবর্গের সহিত গোলকেই বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই প্রেয়সীবর্গ হইতেছেন— আনন্দ চিন্ময়রস-প্রতিভাবিত, শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া শক্তিরূপ অংশ বা কলারূপা ইত্যাদি। ব্রহ্ম সংহিতার "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ" এর অর্থ শ্রীপাদ জীব এইরূপই করিয়াছেন :—

"শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে, অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে গোলক হইতেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকট ব্রজলীলায় আত্মপ্রকাশ করেন।"

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকট লীলারই গৌরব প্রদর্শিত এবং লীলা যে পরকীয়া ভাবময়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও শ্রীরাসমণ্ডলে পরকীয়াভাবময়ীত্ব ব্যঞ্জিত হইলেও ১০।৩৩।৭ শ্লোকে গোপিনীদের "কৃষ্ণবধ্বোঃ" বলা হইয়াছে। রাস পঞ্চাধ্যায়ে গোপীদিগের পরকীয়াত্বভাবের শ্লাঘা ও মহিমা বর্ণিত হইলে, ইহা যে প্রকৃত "স্বকীয়া" ইহা বুঝাইতেও ভাগবত ক্রুটি করেন নাই। ব্যাসদেব অতি বিচক্ষণ, তাহারও কি ভুল হয়? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গোপ-গোপিনীরা সকলেই দেব-দেবী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্যই

তাঁহারা মনুষ্যরূপে জন্ম লইয়াছিলেন। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের লীলাকে মনুষ্যলীলা বলিয়া দেখা বা বুঝাইবার চেষ্টা মূঢ়তা মাত্র। কিজন্য যে বৈষ্ণবাচার্যগণ 'স্বকীয়া' 'পরকীয়া' লইয়া এত তোলপাড় করিয়াছেন তাহা বুঝা কঠিন। শুকদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমাদের মানিয়া লওয়া শ্রেয়। মানুষের কাজ আর শ্রীকৃষ্ণের কাজ কি এক হইতে পারে? তাঁহার সৃষ্ট জীব আমরা; তাঁহার কাজ, তাঁহার জন্য সবই শোভনীয়। রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠে বা শ্রবণে মনুষ্যের মায়ার বন্ধন শিথিল হয়, ইহা জানিলেই যথেষ্ট।

—::—

## বৈষ্ণব সাহিত্য

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিতেছি আমার যতটুকু জানা আছে।

যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসক, তাঁহারা বা যে যে শাস্ত্রে বিষ্ণুর উপাসনাই প্রধানরূপে বর্ণিত, সেই সেই শাস্ত্র 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত। বিষ্ণুপুরাণে আছে,— "গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরোনরঃ। বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥" রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণাদি শাস্ত্র বৈষ্ণবশাস্ত্র। নানা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যগণ যে সকল ভাষ্যাদি লিখিয়াছেন সেগুলিও বৈষ্ণব-সাহিত্য। কয়েকটি সম্প্রদায়ের নামও দিতেছি। যথা—রামানুজীয়, মাধ্ব, বিষ্ণুস্বামী, ব্রহ্মমাধবগৌড়ীয় ও বল্লভীয়। বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, বিদ্যাপতি লিখিত শ্লোকগীতাদি, আদি-চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণবিজয় বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত।



চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে তাঁহার ভক্তগণ যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; তাহাদের বঙ্গানুবাদ ইত্যাদি ঐ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থগুলিকেও বৈষ্ণব সাহিত্য বলা হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যগ্রন্থ অসংখ্য, লেখকও অসংখ্য।

পঞ্চরসের কথা লিখিয়া ইহা শেষ করিব। পঞ্চরস যথা,—আদি বা শৃঙ্গার রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরস। রসভেদে বিশুদ্ধভগবৎ প্রেমেরও কিছু তারতম্য হয়। ভিন্ন ভিন্ন রসের ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদন। শান্তরসে রতি বৃদ্ধি পাইয়া প্রেম পর্য্যন্ত পৌঁছায়; দাস্যরসে উহা স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্য্যন্ত পৌঁছায়; সখ্য রসে আর এক ধাপ উঠিয়া অনুরাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়; বাৎসল্য রসেও তাহাই, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে রতিভাব পর্য্যন্ত উঠে। কেবল মধুর রসে রূঢ় ও অধিরূঢ় মহাভাব বর্ত্তমান থাকে। এই অধিরূঢ় মহাভাবের অবস্থা মনুষ্য মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুতেই বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছিল।

—●—

## গোলক, গোকুল, বৃন্দাবন, মথুরা ও বৈকুণ্ঠ

উপরোক্ত স্থানগুলি সম্বন্ধে অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। মথুরা=উত্তর প্রদেশের একটি নগর, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। ইহা যমুনার তীরবর্ত্তী। ইহাকে মধুপুরীও বলে। দ্বাপর-যুগে ভোজবংশীয় রাজা উগ্রসেনের রাজধানী ছিল মথুরা। শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি। কংস উগ্রসেনের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতেই কংসকে বধ করিয়াছিলেন।

গোকুল= মথুরার পূর্ব্ব-দক্ষিণে যমুনার বাম তীরবর্ত্তী একটি গ্রাম। ইহাই নন্দের বাসভূমি ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা-ভূমি গোকুল।

বৃন্দাবন=মথুরা হইতে তিন ক্রোশ দূরে যমুনার বাম তীরবর্ত্তী নগর ও বন। শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে দানবদের নিহত করিয়া, নন্দ প্রভৃতির সহিত বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। ইহাই রাধা-কৃষ্ণের প্রধান লীলাভূমি।

গোলক=বিষ্ণুর আবাস স্থান। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত 'লোকের' উপর একটি 'লোক'। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আছে, ইহা বৈকুণ্ঠের উপর অবস্থিত এবং ইহার আয়তন ২৫ কোটি যোজন। বিষ্ণুর অভিপ্রায়ে এই গোলক বায়ুর উপর অবস্থিত এবং বিশাল পর্ব্বত দ্বারা ঘেরা। পর্ব্বতের বাহিরে একটি বন আছে, যাহা শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার ক্রীড়ার স্থান।

বৈকুণ্ঠ=বিষ্ণুর এক নাম বৈকুণ্ঠ। লক্ষ্মীর ইচ্ছায় বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ-লোক নির্ম্মাণ করেন।

—::—

## নির্ব্বিকল্প সমাধি

পরমব্রহ্মকে বিভিন্ন ভাষায় পরব্রহ্ম, পুরুষোত্তম, পরমশিব ইত্যাদি বলা হইয়াছে। যোগের পরম লক্ষ্য নিরাকার পরমেশ্বরের উপলব্ধি। এই উপলব্ধির জন্য সুদীর্ঘকাল তপস্যার প্রয়োজন। শুধু শাস্ত্রালাপে কিছুই পাওয়া যায় না। অষ্টাঙ্গ আদর্শের সাধন, গুরু নির্দেশ অনুসারে, কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। গুরু পথ দেখাইয়া দেন মাত্র। এক জন্মের কাজ নয় বহু জন্মের তপস্যার ফলেই ব্রহ্ম উপলব্ধি হইয়া থাকে।

চিত্তের পাঁচটি অবস্থা,—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। প্রথম তিন অবস্থা, যোগ অসম্ভব। একাগ্র অবস্থায় যোগ সম্ভব।



নিরুদ্ধ বা চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ। ব্রহ্ম এক অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব। ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সমাধির মধ্য দিয়াই ইহা লভ্য। সমাধি বহু প্রকারের সম্ভব। ইহার পাঁচটি স্তর,—বাক্, মন, বুদ্ধি বা জ্ঞানাত্মা, মহত্তত্ত্ব ও শান্ত আত্মা। বাক্, মন, বুদ্ধি ও মহত্তত্ত্বকে পাতঞ্জলি বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ছয় প্রকার সমাধি আছে,—সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার, নির্ব্বিচার, সানন্দ ও সস্মিত। ইহার ভিতর প্রথম চারটি সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা এবং ইহাতে কোনও না কোনও অবলম্বন থাকে। অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধ্যাতা ও ধ্যেয়, বিষয়ী ও বিষয়, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের প্রভেদ থাকে। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে কোনও অবলম্বন থাকে, কোনও দ্বৈতভাব থাকে না—সব একাকার হইয়া যায়। প্রথম চারটি সমাধি সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলেই চিত্ত নিরাকার ব্রহ্মসত্তায় লয় হয়। বহুজন্মের তপস্যার ফলেই নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। কাজেই এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু লেখার প্রয়োজন মনে করিতেছি না। নির্ব্বিকল্প সমাধি আয়ত্ত করিয়াছেন এরকম কোনও ভাগ্যবান্ আমার চোখে আজ অবধি পড়ে নাই। প্রথম চারটি সমাধির কথা যাহা বলিয়াছি, তাহার জন্য আধার প্রস্তুত করিয়া অগ্রসর হওয়া সকলেরই উচিত। একাগ্রচিত্তে ইষ্ট দেবতার দ্বারাই তাহা লভ্য। পূর্ব্বজন্মে যদি জপ তপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ জন্মেও কিছু সঞ্চয় করা দরকার। গুরু পাইবার জন্য ব্যস্ত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই, সদ্গুরুর স্থানে অসদ্গুরুর পাল্লায় পড়িয়া যাওয়ার ভয়ই বেশী। 'ওঁ' মন্ত্রে ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিলেই সবই পাইবেন।

—*—

## সুষুপ্তি

স্বপ্নশূন্য গাঢ়নিদ্রাকে সুষুপ্তি বলে। 'সুষুপ্তি' বিষয়ে পঞ্চদশী লিখিয়াছি।

## তুলসী মাহাত্ম্য

কন্যাকুমারী হইতে বদরিকাশ্রম পর্যন্ত যেখানেই যাও সেইখানেই দেখিবে, মানুষ প্রতি পুণ্য কাজে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত তুলসীকে বরণ করে এবং নানা পুষ্পের মাঝে বৃক্ষরূপী তুলসীকে বন্দনা করে। ইহার কারণ অনেকেরই জানা নাই।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তুলসী ছিলেন এক রাজার কন্যা। তিনি বাল্যকাল হইতেই বিষ্ণুভক্ত ছিলেন; বিষ্ণুর পূজা করিতেন। স্বপ্নে তিনি বিষ্ণুর দর্শন পাইতেন। তিনি হৃদয়ে বিষ্ণু ছাড়া কাহাকেও স্থান দেন নাই। তাঁহার যৌবন উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার বিবাহের উদ্দেশ্যে স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেন। তথায় বহু রাজা উপস্থিত হন। সহসা বিচিত্র সজ্জায় অপরূপ সাজে ছদ্মবেশী শঙ্খচূড় আসিয়া উপস্থিত হন। তাহাকে দেখিয়া সব উপস্থিত রাজারা আশ্চর্য্য ও ভীত হইয়া যান। তুলসীও ভীত হইয়া দৈবের বশে শঙ্খচূড়ের গলায় বরমাল্য পরাইয়া দেন। নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া তুলসীকে প্রবোধ দিয়া বলেন, 'দৈবের বশেই ইহা হইয়াছে, তুমি স্বামীকে অন্তরে প্রেমের ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ কর, তোমার মঙ্গল হইবে।'

শঙ্খচূড় ছিলেন ঘোর বিষ্ণু-বিদ্বেষী। তুলসীর বিষ্ণুমূর্তিকে সে ক্রোধে নিক্ষেপ করে। তুলসী তাহা তুলিয়া আনিয়া গোপনে পূজা করিতে থাকে। স্বামী যুদ্ধে বাহির হইলেই তাহার মঙ্গলের



জন্য, তুলসী বিষ্ণুপূজা করিয়া, উপবাস থাকিয়া লক্ষ লক্ষ মহামন্ত্র জপ করিতে থাকেন। সতীর পুণ্যে ও ভক্তিতে শঙ্খচূড়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয় বিষ্ণুতেজ। এইরূপে সতী তুলসীর বিষ্ণুতেজে শঙ্খচূড় দুর্জয় হইয়া উঠে। সেই সময় শ্রীভগবান গোলকবিহারী পৃথিবীতে জন্ম লইয়া ব্রজলীলা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মহামুনি সন্দীপনীর আশ্রমে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলেন। শঙ্খচূড় সেই মুনির পুত্রকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। সেজন্য মুনি তাঁহার পুত্রকে উদ্ধার করিয়া দিতে বলেন। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়কে বধ করিবার জন্য যুদ্ধে আহ্বান করেন। শঙ্খচূড় তুলসীর বিষ্ণুতেজে বলীয়ান হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ অসুবিধায় পড়েন, কারণ তুলসী যুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ বিষ্ণু নাম জপ করিতে-ছিলেন। সেই কারণেই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে ভাসিতেছিল ভক্তিমতী স্নেহময়ী তুলসীর স্মৃতি। তাঁহার পদ্মলোচন ভরিয়া যায় প্রেমাশ্রুতে। বলরাম শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা বুঝিয়া, তাঁহাকে শঙ্খচূড় বধের উপায় বলিয়া দেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দৈবমায়ায় দুই মূর্তি ধারণ করিলেন। এক মূর্তিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, আর এক মূর্তিতে শঙ্খচূড়ের মূর্তি মাঝে দেখা দিলেন প্রিয়া তুলসীকে। তুলসী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া আসিলেন জয়মাল্য পরাইতে ছদ্মবেশী কৃষ্ণের কাছে। তুলসী যে মুহূর্তে ছদ্মবেশী কৃষ্ণকে জয়মাল্য পরাইবার জন্য জপ বন্ধ করিলেন, সেই মুহূর্তেই শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়কে বধ করিলেন। তুলসীর চেতন হইতেই সব বুঝিতে পারিলেন। স্বামীর মৃত্যু ব্যথার ছবি তাঁহার সম্মুখে ভাসিয়া আসিল। ক্রোধে ফেলিয়া দিলেন জয়মাল্য ও নানা অঙ্গাভরণ। মহাসতী তুলসীর জ্বলন্ত অগ্নিসম মূর্তি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীত হইলেন, ত্রিলোক কম্পিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নময় নারায়ণমূর্তিতে

প্রকাশ হইলেন তুলসীর সম্মুখে। ভুবনমোহিনী দুর্গা শান্তিরূপে প্রকাশ পাইলেন তুলসীর হৃদয়ে। তুলসী শান্ত হইয়া শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন, 'হে প্রভু। আমি আজীবন আপনার শ্রীচরণের দাসী, তার ফল কি এই নিষ্ঠুর বৈধব্য?'

বিষ্ণু বলিলেন, 'বাল্য হইতেই তুমি আমার অন্তরের প্রিয়া। দৈবের বশে শঙ্খচূড়ের সহিত তোমার বিবাহ হইয়াছিল। তোমারই পুণ্যে আমার হস্তে নিধন হইয়া শঙ্খচূড় বৈকুণ্ঠে স্থান পাইয়াছে। আজ হইতে তুমি থাকিবে আমার অন্তরে আমার প্রিয়া হইয়া। জগত মাঝে চিরপূজিত হইবে বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসী নামে।

তাই নারায়ণ-প্রিয়া তুলসী আজও ভারতভূমিতে বরণীয়া ও চিরআদরিণী হইয়া মানুষের মনের মাঝে শ্রদ্ধার আঁচল পাতিয়া প্রতি গৃহে বৃক্ষরূপে বিরাজিত আছেন, তাই আজ ভারতবাসী প্রতি পুণ্য কাজে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত প্রদীপ জ্বালাইয়া তুলসীকে বন্দনা করে,—

"ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িন্যৈ সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও পদ্মপুরাণে তুলসীর কাহিনীগুলি একেবারে অনুরূপ। পদ্মপুরাণে শঙ্খচূড়ের নাম নাই; সে জায়গায় আছে জলন্ধর)

—●—



## অধিপতি

| | |
|---|---|
| গরুড়=পক্ষিগণ | চিত্ররথ=গন্ধর্ব্ব |
| উচ্চৈঃশ্রবা=অশ্ব | দক্ষ=প্রজাপতি |
| তক্ষক=সর্প | ঐরাবত=গজ |
| প্লক্ষ=বনস্পতি | বরুণ=জলরাশি |
| বাসব=মরুদ্গণ | পাবক=বসুগণ |
| প্রহ্লাদ=দৈত্য ও দানব | বাসুকী=নাগগণ |
| যম=পিতৃগণ | বিষ্ণু=আদিত্য |
| শার্দূল=মৃগগণ | হিমবাণ=শৈলগণ |
| সাগর=নদীগণ। | |

—*—

## আদিত্য

দেবমাতৃকা অদিতিপুত্র—বরুণ, সূর্য্য, বেদাঙ্গ, ভানু, রবি, গাভস্তি, যম, স্বর্ণরেতা, দিবাকর, মিত্র ও বিষ্ণু।

সূর্য্যের প্রতীক—বার মাসের এই ১২ নাম।

—::—

## গণদেবতা

ইহারা শিবের অনুচর, কৈলাসে বাস করেন। গণেশ ইহাদের নেতা—আদিত্য, বিশ্বদেব, বসু, তুষিত, আভাস্বর, বাত, মহারাজিক, সাধ্য এবং রুদ্র।

—●—

## মহাবাক্য

বেদে যে সকল বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব দেখান হইয়াছে, উহাদিগকে মহাবাক্য বলে; যথা,—(১) 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'—ঋগ্বেদের মহাবাক্য। (২) 'অহং-ব্রহ্মাস্মি'—যজুর্বেদের মহাবাক্য। (৩) 'তত্ত্বমসি'— 'সামবেদের মহাবাক্য। (৪) 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—অথর্ব্ববেদের মহাবাক্য।

'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' এর অর্থ, প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। প্রজ্ঞান শব্দের অর্থ কূটস্থ চৈতন্য। জীবে অবস্থিত কূটস্থ চৈতন্যই ব্রহ্ম। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অর্থ আমিই ব্রহ্ম।

'তত্ত্বমসি' অর্থ সেই ঈশ্বররূপ ব্রহ্মই তুমি।

'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। অয়ং আত্মা বলিতে সাক্ষী চৈতন্য বা কূটস্থ-চৈতন্য বুঝায়।

কাজেই এই চারটি মহাবাক্যের অর্থ একই।

—*—

## পঞ্চকোষ

(১) অন্নময়কোষ, (২) প্রাণময়কোষ, (৩) মনোময়কোষ, (৪) বিজ্ঞানময়কোষ ও (৫) আনন্দময়কোষ।

অন্নময়কোষ—স্থূলদেহ। প্রাণময়কোষ—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়+পঞ্চ-প্রাণ। মনোময়কোষ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়+নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। আনন্দময়কোষ—সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানরূপ কারণ শরীর।

প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ ও বিজ্ঞানময়কোষ এই তিন মিলিয়া সূক্ষ্মদেহ। এই পঞ্চকোষ দ্বারা আত্মা আবৃত থাকে।

=●=



## সপ্তজিহ্বা

অগ্নির সাতটি লেলায়মান জিহ্বা—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী বিশ্বরুচী। মুণ্ডঃ ১।২।৪

—*—

## সপ্তলোক

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, জন, মহঃ, তপঃ ও সত্য।

—*—

## সপ্তসমুদ্র

লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দধিমণ্ড, ক্ষীর ও স্বাদূদক।

—*—

## সপ্তস্বর

ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ।

—★—

## সপ্তপাতাল

অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল।

—●—

## সপ্তদ্বীপ

জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর।

—*—

## মৃত্যুর পর

মনুষ্যের মরণের অব্যবহিত পরেই 'আতিবাহিক' নামক দেহ-লাভ হয়। প্রেতপিণ্ড-দানের দ্বারা এই দেহের পরিবর্ত্তে 'ভোগদেহ' নামক এক দেহ হয়। সংবৎসরান্তে সপিণ্ডীকরণ

শ্রাদ্ধদ্বারা ভোগদেহের পরিবর্ত্তে অন্য দেহ লাভ হয়। তখন কর্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে গমন হয়। কিন্তু কুলনাশে পিণ্ডাদি-দাতার অভাববশতঃ প্রেতাত্মার নিরন্তর নরক বাস হয়।

শ্রীরঘুনন্দন কৃত শুদ্ধিতত্ত্ব।

—::—

## 'ভগবান'

সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য— এই ছয়টিকে 'ভগ' বলে। পূর্ণভাবে এই ছয়টি যাঁহাতে বিদ্যমান তিনিই 'ভগবান'।

—●—

## ষড়্বিধ ধর্ম্ম (বিকার)

জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ—এই ছয়টি ষড়্বিধ ধর্ম্ম।

—=—

## সমাধি

সমাধীয়তে অস্মিন্ ইতি সমাধিঃ। পুরুষের উপভোগের জন্য বাসনারূপ সকল বস্তু যাহাতে সমাহিত হয় তাহা সমাধি= অন্তঃকরণ।

=●=

## জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান=শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশজাত।

বিজ্ঞান=নিদিধ্যাসনজাত।

—*—



## পঞ্চদশী

এই গ্রন্থের লেখক মাধবাচার্য্য। ইহার সন্ন্যাস নাম 'বিদ্যারণ্য'। অদ্বৈত-বেদান্ত বুঝিবার পক্ষে ইহা অতি সুন্দর গ্রন্থ। ব্রহ্মস্বরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ, জীব, জগৎ, ঈশ্বর, মায়া প্রভৃতির স্বরূপ অতি বিস্তৃত ও প্রাঞ্জলভাবে নানা উদাহরণ দিয়া বুঝান হইয়াছে। উপনিষদ্গুলি ও গীতা বেশ ভালভাবে পাঠ করিয়া, উপনিষদ্-গুলিতে কি আছে, গীতাতে কি আছে তাহা ভালভাবে জানিয়া তারপর পঞ্চদশী পাঠ করিলেই উপকার পাইবেন; নচেৎ সাধারণের পক্ষে ইহা বুঝা কঠিন। ভুল বোঝাবুঝিরও সম্ভাবনা আছে। শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সরল পঞ্চদশী' পড়িয়া আমার ভালই লাগিয়াছে।

পঞ্চদশীতে ১৫৩০টি শ্লোক আছে। তিন খণ্ডে ইহা সমাপ্ত। প্রতি খণ্ডে পাঁচটি করিয়া অধ্যায়। প্রতিটি অধ্যায়ই ধৈর্য্য ধরিয়া পড়া উচিত; যুক্তি দ্বারা সব বুঝান হইয়াছে। এই সম্বন্ধে পুস্তক পাঠে অদ্বৈত-বেদান্ত অনেক কিছু জানা যাইবে। সংক্ষেপে কেবল আখ্যান ভাগ দিলাম :—

—*—

## প্রথম অধ্যায়

(তত্ত্ববিবেক)

জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থায় এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে জ্ঞানের বিষয় সকল ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু জ্ঞান এক এবং স্বয়ং প্রকাশ।

সুষুপ্তি কালীন যে অজ্ঞান অবস্থা তাহা প্রকৃত অজ্ঞান অবস্থা নয়, কারণ সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত পুরুষের সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের

স্মৃতি থাকে, যাহা সুষুপ্তিকালে অনুভূত হইয়াছিল। আমি যেন সর্ব্বদা থাকি, আমার যেন সর্ব্বদা অভাব না হয় এইরূপ সকলের নিজের প্রতি প্রীতি হয়। কিন্তু এই প্রীতিতে যে আনন্দ তাহার একটি প্রতিবন্ধক সব সময়ই বর্ত্তমান। যে দিন বুঝিব যে সেই 'আমি' বা 'আমার' অর্থ 'আত্মা' ও 'আত্মার' তখন আত্মার আনন্দরূপতা শুধু রহিয়া যাইবে। এই আনন্দের প্রতিবন্ধক মোহকারিণী অনাদি অবিদ্যা।

প্রকৃতি দুই প্রকার—শুদ্ধ প্রকৃতি 'মায়া' এবং অবিশুদ্ধ প্রকৃতির নাম অবিদ্যা। মায়াতে যে ব্রহ্মের বা শুদ্ধ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব, তাহা মায়াকে প্রভাবিত করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বররূপ ধারণ করেন। অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব। সেইজন্য জীব অবিদ্যার বশবর্ত্তী। সেই অবিদ্যাই কারণ-শরীর। অবিদ্যাতে অভিমানী চৈতন্যই প্রাজ্ঞ। এই অধ্যায়ে প্রকৃতির সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে সূক্ষ্মদেহের বোধ থাকে না কিন্তু আত্মার প্রকাশ থাকে, তাহাই আত্মার অন্বয়।

যিনি তামসী মায়াকে লইয়া জগতের উপাদান কারণ এবং শুদ্ধ মায়াকে অবলম্বন করিয়া জগতের নিমিত্ত কারণ, সেই ঈশ্বররূপ ব্রহ্মই 'তৎ' শব্দ দ্বারা বাহিত হইয়াছেন। সেই ব্রহ্ম যখন অশুদ্ধ, কর্ম্ম দ্বারা মলিন মায়াকে অবলম্বন করেন, তখন তিনি 'ত্বং' পদ দ্বারা উক্ত হন। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাকাব্য বিচার দ্বারা, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য সিদ্ধ হয়।

এই অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও নির্বিকল্প সমাধির কথা।

—●—



## দ্বিতীয় অধ্যায়

(ভূত-বিবেক)

এই অধ্যায়ে পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়সকল, মন ও কর্ত্তা জীব, ইহাদের স্বরূপ ও কার্য্য বর্ণনা করা হইয়াছে। শূন্যবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া, মায়ার স্বরূপ কি তাহা বুঝান হইয়াছে।

—※—

## তৃতীয় অধ্যায়

(পঞ্চকোষ বিবেক)

এই স্থূলদেহে বা অন্নময় কোষের অভ্যন্তরে প্রাণময়কোষ; উহার অভ্যন্তরে মনোময় কোষ, তাহার অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ এবং তাহারও অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ। পর পর আভ্যন্তর পাঁচটি গুহা। ইহার কোনটিই আত্মা নহে। কিন্তু আনন্দময় কোষে যাহার প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় তিনিই আত্মা। এই আনন্দের দ্বারাই জীবগণ বাঁচিয়া থাকে। মানুষ যদি 'আমার' বলিতে সব কিছু ত্যাগ করিয়া, কেবল 'আমি' ছাড়া আর কিছু নাই, এই ভাবের একাগ্রচিত্তে উপলব্ধি করিবার অভ্যাস করে তাহা হইলে শীঘ্রই তাহার আত্মানুভূতি হয়।

—::—

## চতুর্থ অধ্যায়

(দ্বৈত-বিবেক)

এই অধ্যায়ে ঈশ্বরসৃষ্ট এবং জীবসৃষ্ট দ্বৈতের বিবেক করা হইয়াছে। ইহাতে উভয়ের তত্ত্ব অবগত হইলে জীবের পরিত্যাজ্য বিষয়গুলি স্পষ্ট হইবে।

—•—

## পঞ্চম অধ্যায়

(মহাবাক্য-বিবেক)

মহাবাক্য প্রধানত: চারটি :—

(১) "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—ঋগ্ বেদের মহাকাব্য।

(২) "অহং ব্রহ্মাস্মি"—যজুর্বেদের মহাবাক্য।

(৩) "তত্ত্বমসি"—সামবেদের মহাবাক্য।

(৪) "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—অথর্ব্ববেদের মহাকাব্য।

অন্তঃকরণ বৃত্তি সমূহে ভাসমান্ চৈতন্যই 'প্রজ্ঞান' অর্থাৎ জীব সাক্ষীরূপ। কূটস্থচৈতন্য এই প্রজ্ঞানই সর্ব্বত্র অবস্থিত এবং ইহাই ব্রহ্ম।

—*—

## ষষ্ঠ অধ্যায় (চিত্রদ্বীপ)

এই অধ্যায়ে একটি চিত্রপটের চারটি অবস্থার দৃষ্টান্ত দিয়া তাহার সাহায্যে ব্রহ্মের অবিদ্যাকল্পিত চারটি অবস্থার কথা বলা হইয়াছে।

'এই সংসার পরমার্থত: সত্য এবং ইহা আত্মবস্তুতে লাগিয়া আছে— এই প্রকার ভ্রান্তিই অবিদ্যা।' বিদ্যা বা জ্ঞান দ্বারা উহার নিবৃত্তি হয়। 'আত্মার আভাস জীবেরই সংসার; আত্মার সংসার হয় না'— এই প্রকার বোধের নাম বিদ্যা।

—*—

## সপ্তম অধ্যায়

(তৃপ্তিদীপ)

"জীব যদি বুঝিতে পারে যে, আমিই পরমাত্ম-স্বরূপ তবে কি ইচ্ছা করিয়া, এবং কিসের কামনায় সে শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া জ্বর বা তিনদেহের দুঃখ ভোগ করিবে?



এই অধ্যায়ে দশম পুরুষের সাত অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। বিভ্রমবশতঃ গণনাকারী নিজেকে 'আমিই দশম পুরুষ' ইহা জানিতে পারে না। পরোক্ষ জ্ঞান ও অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় বিচার দ্বারা বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে। ভৃগু পিতা বরুণের নিকট ব্রহ্মের সামান্য লক্ষণ পরোক্ষভাবে অবগত হইয়া পরে অন্নময়াদি পঞ্চ-কোষের বিচার দ্বারা স্বীয় আত্মার ব্রহ্মস্বরূপত্ব অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পুনঃপুনঃ পঞ্চকোষের বিচার দ্বারা, এবং পরে 'নেতি' 'নেতি' রীতিতে বিচার করিয়া কিরূপে ব্রহ্ম উপলব্ধি করা যায় তাহা এই অধ্যায়ে ভালভাবে দেখান হইয়াছে। 'যাহা করিবার ছিল তাহা করা হইয়াছে এবং যাহা পাইবার ছিল তাহা পাওয়া হইয়াছে' এই ভাবিয়া জ্ঞানী সম্যক্ তৃপ্তি-লাভ করেন।

—●—

## অষ্টম অধ্যায়

(কূটস্থদীপ)

এই অধ্যায়ে দেহ, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি বিকারী বস্তু সকলের নির্বিকার সাক্ষীরূপে দেহ মধ্যে অবস্থিত বলিয়া প্রতীত, দেহাদির অধিষ্ঠানস্বরূপ কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'কূটস্থদীপ'।

—=—

## নবম অধ্যায়

(ধ্যানদীপ)

নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকাদি-সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন অধিকারী পুরুষ ব্যতীত অন্যের পক্ষে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন মোক্ষসিদ্ধিলাভ

সম্ভব নয়। তাহাদের জন্য নির্গুণোপাসনা উক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'ধ্যানদীপ'।

ভ্রম দুই প্রকার:—যে ভ্রম ফলাভাব প্রযুক্ত তাহা বিসংবাদি ভ্রম এবং যে ভ্রম ফলপ্রদ তাহাকে সংবাদি ভ্রম বলে। যদিও শাস্ত্রে মহাবাক্য সকল দ্বারা ব্রহ্ম আত্ম-স্বরূপেরই বর্ণিত হইয়াছেন, তথাপি বিচারহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা দুর্বোধ্য। শ্রদ্ধাবান শাস্ত্রদর্শী পুরুষের শাস্ত্র হইতে পরোক্ষ জ্ঞানলাভ অনায়াসগম্য। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিরই বৈদিক কার্য্যে অধিকার। গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে অশ্রদ্ধা থাকিলে পরোক্ষ জ্ঞান হয় না। বিচার ব্যতীত অপরোক্ষ-জ্ঞান হয় না। যতদিন না এই জ্ঞান হয় ততদিন পুনঃপুনঃ বিচারের আবশ্যক।

নির্গুণোপাসনা জ্ঞানের অতি নিকটবর্ত্তী। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে পুরুষের অন্তরে অসঙ্গ আত্মাই বাকী থাকিয়া যান। পুনঃ-পুনঃ এই সমাধির অভ্যাস দ্বারা তাহার সংস্কার দৃঢ় হইলে মহাবাক্য তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

নচিকেতার প্রশ্নে যম বলিয়াছেন—"এই ওঁকাররূপ আলম্বনকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়" যিনি সম্যক্‌প্রকার নির্গুণোপাসনা করেন, তিনি ইহলোকেই হউক, বা মরণকালেই হউক বা ব্রহ্মলোকেই হউক, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন।

==

## দশম অধ্যায়

### (নাটকদীপ)

এই অধ্যায়ে নাটকের দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবাত্মার স্বরূপ দেখান হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'নাটকদীপ'।

—*—



## একাদশ অধ্যায়

### (ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ)

এই অধ্যায়ে যে ব্রহ্মানন্দের কথা বলা হইয়াছে; তাহা সম্যক্ জ্ঞাত হইলে, দেহ, পুত্র, বিত্তাদি-বিষয়ে 'আমি'-ও আমার জ্ঞানবশতঃ যে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও মৃত্যুর পর পাপাদির জন্য নরকাদি ভোগ ইত্যাদি অনর্থ সমূহকে ত্যাগ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে।

পঞ্চবেদ, পুরাণ ও বিবিধ শাস্ত্র জানিয়াও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারায় নারদ অত্যন্ত শোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে সনৎকুমার বলিয়াছিলেন "ভুমাই এই সুখের পার", "পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে সুখ নাই"।

মনই মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ— বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের এনির্বিষয় মন মুক্তির কারণ।

—*—

## দ্বাদশ অধ্যায়

### (ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ)

আত্মাই পরম-প্রেমের আস্পদ। লোক যাহা কিছু করে, উহা সব আত্মাপ্রীতির জন্য; অপরের প্রীতির জন্য নয়। 'আত্মার স্বরূপকে অনুবর্ত্তন করে যে সাত্ত্বিকীবৃত্তি, তাহাই আত্মপ্রীতি।

—*—

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

### (ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ)

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে— "আকাশ হইতে স্বদেহ পর্য্যন্ত জগৎ আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে" সেইজন্য আত্মানন্দের

অদ্বৈত ব্রহ্মতা সিদ্ধ হয়। আনন্দ হইতে এই জগতে উৎপন্ন, আনন্দেই অবস্থিত এবং আনন্দেই উহার লয় হয়"। লৌকিক ব্যবহারকে উপেক্ষা করিলে বুদ্ধি নির্বিঘ্নে ব্রহ্মচিন্তা করিতে পারে। তখন সেই জ্ঞানীপুরুষ নটের ন্যায় কৃত্রিম আস্থার সহিত লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন করেন। দর্পণকে না দেখিয়া উহার অন্তঃস্থ প্রতিবিম্বকে দেখা যায় না, এইরূপ সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মকে অগ্রে গ্রহণ না করিয়া কিরূপে নাম জপের গ্রহণ হইবে? সকল বস্তুর দর্শনকালে প্রথমেই যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ভাসমান হন, উহাতেই বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়া তাহার পর বুদ্ধিতে আর নামরূপের ধারণা করিও না। এই অদ্বৈতানন্দে জনগণ চিরকাল বিশ্রাম করুক।

—●—

## চতুর্দশ অধ্যায়

(ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ)

যোগ দ্বারা, আত্মবিচার দ্বারা এবং দ্বৈতের মিথ্যাত্ব-চিন্তন দ্বারা যিনি ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহার যে বিদ্যানন্দের অনুভব হয়, তাহা এই অধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে। এ বিষয়ে এখানে আর কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না।

—::—

## পঞ্চদশ অধ্যায়

(ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ)

মনের তিন প্রকার বৃত্তি:— শান্ত, ঘোর ও মূঢ়। বৈরাগ্য, ক্ষমা, উদারতা প্রভৃতি শান্ত বৃত্তি। তৃষ্ণা, স্নেহ, রাগ, লোভ প্রভৃতি ঘোর বৃত্তি। মোহ, ভয় প্রভৃতি মূঢ় বৃত্তি। এই সকল বৃত্তিতেই ব্রহ্মের চিদ্রূপতা প্রতিবিম্বিত হয়।



ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিদ্বয়ে মায়া দুঃখরূপে প্রকাশিত হয়। এই অধ্যায়ে কোন বৃত্তিতে কিরূপ ধ্যান করা উচিত তাহা বলা হইয়াছে। আমি সংক্ষেপে পঞ্চদশী লিখিলাম, সাধারণভাবে পঞ্চদশীতে কি আছে জানিবার জন্য। অতি ধৈর্য্য সহকারে পঞ্চদশী পাঠ করিতে হয়। ইহা সাধারণের বোধগম্য নহে। কোনও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যাহার পঞ্চদশী সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান আছে, তাঁহার সাহায্যেই পঞ্চদশী পাঠ করা উচিত।

—•—

## পরস্পর বিরোধিনী স্মৃতি ও শ্রুতি

ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। ধর্ম্ম বেদমূলক। প্রথমে বেদজ্ঞান, পরে অর্থের অনুষ্ঠান, তৎপরে সিদ্ধি; সুতরাং পরভবিক সিদ্ধপুরুষের কথায় পূর্ব্বসিদ্ধি বেদার্থের অন্যথা করা অন্যায্য। সিদ্ধপুরুষ অনেক, তাঁহাদের স্মৃতিও অনেক; সুতরাং সিদ্ধপুরুষগণের ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি পরস্পর বিরুদ্ধবাদিনী হইলে শ্রুতির আশ্রয় ব্যতীত সে সকলের বিরোধভঞ্জন হইতেই পারে না। যেহেতু মানব-বুদ্ধি বিচিত্র, সকলে সমান বুঝে না, সেইহেতু স্মৃতি বিরোধস্থলে কোন্ স্মৃতি শ্রুতি-অনুসারিণী আর কোন্ স্মৃতি শ্রুতিবিরোধিনী তাহা পরিদর্শন করিয়া বুদ্ধিকে সৎপথগামিনী করা উচিত। স্মৃতি পরস্পর বিরোধিনী হইলে, যাহা শ্রুতি অনুগামিনী তাহাই গ্রাহ্য, অন্য স্মৃতি অগ্রাহ্য।

বেদান্ত দর্শন ২য় অ, ১ম প।

——

## বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম

গৌতম বুদ্ধ পূর্ব্বে কি ছিলেন ও কি প্রকারে বোধিসত্ত্ব গৌতম হইলেন ইহা সকলেরই জানা আছে। তাহা এখানে লিখিয়া কোনও কাজ হইবে না। তাঁহার ধর্ম্ম কি ও তিনি কি শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা সহজভাবে জানাইবার চেষ্টা করিব।

সিদ্ধার্থকে আমরা প্রথম পাই শাক্যমুনি রূপে রাজগৃহে (মগধে)। সেখান হইতে তিনি যান বৈশালী নগরে। এখানে তিনি আসেন অরদ-কলমা নামে এক ব্রাহ্মণের কাছে শিক্ষার জন্য। সেই ব্রাহ্মণ ছিলেন কপিলের সাংখ্যবাদী। অরদ তাঁহাকে আত্মার অমৃতত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। বদ্ধ আত্মা কিভাবে মুক্তি পায় সে শিক্ষাও দিলেন।

সিদ্ধার্থ তাঁহার শিক্ষায় সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি দেখিলেন যে, আত্মার 'আমি ভাব'ই যত দুঃখের কারণ। তিনি বলিলেন, যদি আত্মা হইতে 'আমি ভাবের' গুণগুলি সরাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আত্মার অস্তিত্বই থাকিবে না; যথা—অগ্নি হইতে উত্তাপ সরাইতে পারিলে অগ্নির অস্তিত্ব থাকে না। তিনি আত্মাকে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক ভাবে দেখিলেন না। কাজেই অবদ-কলমকে ত্যাগ করিয়া, উদ্রক—রামপুত্র নামক কানড়ার এক ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি বৈশেষিক মতাবলম্বী। তিনিও আত্মার অমৃতত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন এবং শিক্ষা দিলেন 'কর্ম্ম' ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে। সিদ্ধার্থ এই বিষয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং কর্ম্ম ও কর্ম্মফল স্বীকার করিলেন। কিন্তু আত্মার পুনর্জন্ম স্বীকার করিলেন না। মানুষের 'আমি ভাব' ক্রমবিকাশের ফল। তিনি পুনর্জন্ম স্বীকার করিলেন, কিন্তু আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি স্বীকার করিলেন না। সিদ্ধার্থ উদ্রক্‌কে ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মমন্দিরে পূজারীদের আশ্রয় লইলেন। তথায় পশুবলি দেখিয়া তাঁহার মন ব্যথিত হইল। তিনি ঠিক করিলেন অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। পূজা মন্ত্র সবই অর্থশূন্য; ত্যাগই একমাত্র উপায়।



সেখান হইতে তিনি গেলেন উরুভেলা (বোধগয়া)। সেখানে গিয়া তিনি কৌন্‌দিন্য প্রভৃতি পঞ্চ ভিক্ষুককে গভীর তপস্যায় রত দেখিলেন। তাহারা সকলেই উদ্রকের শিষ্য ছিলেন। তথায় সিদ্ধার্থ ছয় বৎসর গভীর তপস্যায় কাটাইলেন। তাহাতে তাঁহার শরীর কঙ্কাল হইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন এই কৃচ্ছ্র সাধনে কোনও ফল হইবে না। তখন তিনি সুজাতা নামে এক স্ত্রীলোকের সেবায় সুস্থ হইয়া, এক বোধিবৃক্ষের তলায় বসিয়া সত্যের সন্ধানে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কি উপায়ে রোগ, শোক, দুঃখ জরা ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

তিনি বুঝিলেন, নির্বাণ নিম্নলিখিত চার সত্যের উপর নির্ভর করিতেছে। যেদিন মানুষ রোগ, শোক, দুঃখ, জরা ও মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, সেই দিনই তাহার নির্বাণ হইবে।

প্রথম সত্য, দৈহিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্ট জন্মের সহিত আসিয়া থাকে।

দ্বিতীয় সত্য, মানুষের কামনাই দুঃখ দুর্দ্দশার কারন।

তৃতীয় সত্য, লোভ, লিপ্সা বা কামনাশূন্য হইলেই নির্বান প্রাপ্তি হয়।

তাঁহার চতুর্থ সত্য, নির্বাণ প্রাপ্তির উপায়। সেই পথ তিনি আট ভাগে ভাগ করিয়াছেন,—(১) সঠিক ধারণা বা অনুভূতি, (২)

সত্য সঙ্কল্প, (৩) উচিত কথন, (৪) উচিত কার্য্য, (৫) নির্ম্মল চিন্তা, (৬) প্রকৃত চেষ্টা, (৭) ন্যায়ভাবে জীবিকা উপার্জন ও (৮) মানসিক শান্তি। ইহাই সত্য, ইহাই ধর্ম্ম।

তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, কৃচ্ছ্র সাধনে কেবল শরীর নষ্ট হয়; তাহা দ্বারা প্রকৃত লাভ কিছু হয় না। তিনি সকলকে শরীর সুস্থ রাখিয়া ন্যায় পথে চলিতে উপদেশ দিয়াছেন। ন্যায় পথে চলার কথা যাহা তিনি বলিয়াছেন, তাহা অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা হইতে নূতন কথা কিছুই বলেন নাই। তিনি চিন্তা শুদ্ধির যে সপ্ত রত্নের উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও কিছু নূতন নহে; সব কিছুই হিন্দুশাস্ত্র হইতে লওয়া। তিনি ঐগুলিই সুন্দরভাবে উপমা দিয়া গল্পের ছলে বুঝাইয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, 'আমি প্রথম বুদ্ধ নহি এবং শেষ বুদ্ধও নহি। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্ত্তা বলিয়া কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। কোনও পূজা পদ্ধতিতেও বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মে বেদ, বেদান্ত বা অন্য কোনও হিন্দু শাস্ত্রের কোনও নামও নাই। তিনি যেভাবে নির্বাণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যরাও ধারণা করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে মতান্তর হয় এবং তাঁহারা চার শ্রেণীর বৌদ্ধ হইয়া বিভক্ত হইয়া পড়েন। নির্বাণ বলিতে কি বুঝায় তাহা বৌদ্ধেরা আজও ঠিক করিতে পারেন নাই। ইহা প্রত্যক্ষবাদ না তাহার বিপরীত বা অপর কিছু তাহাও বুঝা যায় না। যদিও তিনি ঈশ্বর বা পূজাদি বিশ্বাস করিতেন না,



তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীরা, তাঁহার মূর্ত্তির ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিয়া থাকেন, বা উপাসনা করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ মন্দির করিয়া, সেখানে বেদীতে বৌদ্ধ মূর্ত্তি রাখিয়া, ধূপ-ধূনা দিয়া পূজা হইতে দেখা যায়।

যে যুগে বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রচার করেন, তখন দেশে হিন্দু-শাস্ত্রীয়-ধর্ম্ম বলিয়া কিছুই ছিল না। ব্রাহ্মণ পূজারীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রের নানা কুব্যাখ্যা করিয়া, অশিক্ষিত জনসাধারণকে নানা-ভাবে উৎপীড়ন করিতেন। জাতিভেদ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

সমাপ্ত

## সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **অ** | |
| অবতার | ৮০ |
| অনন্ত ব্রহ্ম | ১৫৮ |
| অজপাতপঃ | ১৭১ |
| হিন্দুশাস্ত্র ও অধুনা সমাজ | ১৬৫ |
| অন্নময়কোষ | ১৯৪ |
| অষ্টপাশ | ২০৮ |
| অষ্টনায়িকা | ২০৮ |
| **আ** | |
| আমিবোধ | ২৬ |
| **ঈ** | |
| ঈশোপনিষৎ | ১৭ |
| ঈশ্বর উপাসনা | ১৬১ |
| ঈশ্বর তত্ত্ব | ১৭১ |
| **উ** | |
| উপনিষদ্ | ১৬ |
| উপনিষদের সারকথা | ২৪ |
| উপদেশ (মহাভারত হইতে) | ১৬০ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ঋ | |
| ঋগ্বেদ | ৬ |
| ঋক্‌বিধান | ১১ |
| ঐ | |
| ঐতেরেয়োপনিষৎ | ২৩ |
| ও | |
| ওঁকার | ২৯ |
| ঔ | |
| ঔলুক দর্শন | ১৬৪ |
| ক | |
| কঠোপনিষৎ | ১৮ |
| কপিল সাংখ্য দর্শন | ৩৪—১৬২ |
| কর্ম্মফল | ৮১ |
| কুলকুণ্ডলিনী | ১৭৪ |
| কেনোপনিষদ | ১৮ |
| কণাদ | ১৬৪ |
| গ | |
| গীতা | ১৩১ |
| গায়ত্রী মন্ত্র | ৩২ |
| গুরু শিষ্য প্রসঙ্গ | ১৯৭ |
| চ | |
| শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্য | ১০৪ |



| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ছা | |
| ছান্দোগ্যোপনিষৎ | ১৬ |
| জ | |
| জীব | ২৬ |
| জীবের তিনটি পর্য্যায় | ১৮৬ |
| জপাংসিদ্ধি | ১৮৭ |
| জীবাবর্ত্ত | ১৯৬ |
| জ্ঞান | ১৯৭ |
| জপ | ১৯৭ |
| ত | |
| তৈত্তিরীয়োপনিষৎ | ২২ |
| ত্রিগুণ | ৩৩, ১৫৯ |
| তন্ত্র | ১২৯ |
| তুরীয় | ১৮৪ |
| তুলসী মাহাত্ম্য | ২১৮ |
| দ | |
| দৈব | |
| দর্শন | ১৬২ |
| দর্শন বৈশেষিক | ১৬৪ |
| দর্শন ন্যায় | ১৬২ |
| দর্শন পূর্ব্বমীমাংসা | ১৬৩ |
| দর্শন বেদান্ত | ১৬২ |
| দর্শন পাতঞ্জল | ১৬৩ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **ধ** | |
| ধ্রুবনীতি | ১৫৯ |
| ধারণা | ১৭৮ |
| ধর্ম্মশাস্ত্র | ৪১ |
| **ন** | |
| নীতিসার | ৭১ |
| নির্ব্বিকল্প সমাধি | ২১৬ |
| **প** | |
| পঞ্চবট | ২০৮ |
| পঞ্চযজ্ঞ | ১৬০ |
| প্রাণায়াম | ১৯৫ |
| প্রাণময় কোষ | ১৯৪ |
| পাপ-পূণ্য বিচার | ১৬৯ |
| পাশ (অষ্টপাশ) | ২০৮ |
| প্রশ্নোপনিষৎ | ২০ |
| প্রণবমন্ত্র ওঁ | ২৯ |
| পুরাণ | ৬১ |
| পুরাণ ব্রহ্মাণ্ড | ৬৩ |
| পুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত | ৬৪ |
| পুরাণ মার্কণ্ডেয় | ৬৫ |
| পুরাণ ভবিষ্য | ৬৬ |





| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| পুরাণ বামন | ৬৬ |
| পুরাণ ব্রহ্ম | ৬৭ |
| পুরাণ বিষ্ণু | ৬৮ |
| পুরাণ নারদীয় | ৬৮ |
| পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবদ | ৭০ |
| পুরাণ গরুড় | ৭০ |
| পুরাণ পদ্ম | ৭৬ |
| পুরাণ বরাহ | ৭৬ |
| পুরাণ মৎস | ৭৭ |
| পুরাণ কর্ম্ম | ৭৭ |
| পুরাণ লিঙ্গ | ৭৮ |
| পুরাণ বায়ু | ৭৮ |
| পুরাণ স্কন্দ | ৭৯ |
| পুরাণ অগ্নি | ৭৯ |
| প্রারব্ধ | ১৮৩, ১৯৫ |
| পঞ্চদশী | ২২৫ |
| পঞ্চ কোষ | ২২২ |
| পরমানুবাদ | ১৬৪ |
| **ব** | |
| বেদ | ১ |
| বেদের অর্থ ও উচ্চারণ | ১০ |
| বেদাঙ্গ | ১১ |
| বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ | ১২ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ব্রহ্মাভ্যাস | ১৬০ |
| ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা | ১৯১ |
| বিভূতি (অষ্ট বিভূতি) | ২০৮ |
| ব্রহ্মসূত্র ও | |
| বেদান্ত দর্শন | ৫০ |
| ব্রহ্ম বিচার | ১৫৫ |
| ব্রহ্ম (অনন্ত ব্রহ্ম) | ১৫৮ |
| বোধ স্বরূপ | ১৬৭ |
| বৈষ্ণব সম্প্রদায় | ২০৭ |
| বৈষ্ণব ধর্ম্ম | ২০৯ |
| বৈষ্ণব সাহিত্য | ২১৪ |
| ভ | |
| ভাগবত | ৮৪ |
| ভাল মন্দ | ১৬৯ |
| ম | |
| মণ্ডুকোপনিষদ্ | ২১ |
| মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ | ২২ |
| মায়া ও ত্রিগুণ | ৩৩ |
| মহাভারত | ৫৩ |
| মান্ধাতা | ৯৩ |
| মহাজ্ঞান | ১৮০ |
| মৃত্যুভয় | ১৮৭ |
| মুক্তি | ৩১ |
| মহাবাক্য | ২২২ |





| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| র | |
| রামায়ণ | ৪২ |
| রামায়ণ তুলসীদাস | ৪৬ |
| রাসপঞ্চাধ্যায় | ২০৯ |
| ল | |
| লুপ্তযোগ | ১৬৫ |
| শ | |
| শ্বেতাশ্বরোপনিষদ্ | ১২ ৩ |
| শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ | ৯১ |
| শ্রীমদ্ভাগবদ | ৮৪ |
| ষ | |
| ষটচক্র | ১৯৯ |
| স | |
| সাংখ্য দর্শন | ১৪, ১৬২ |
| সোম | ৩৯ |
| সন্ন্যাস | ১৫২ |
| সৎপথ | ১৬৬ |
| সূক্ষ্মদেহ | ১৬৯ |
| স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্ম্মশাস্ত্র | ৪১ |
| সপ্তভূমি ও ষট্‌চক্র | ১৯৯ |
| সৃষ্টিতে নিয়ম | ২০০ |
| সংসারী ও অধ্যাত্ম জগৎ | ২০৩ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| সপ্তজিহ্বা | ২২৩ |
| সপ্তলোক | ২২৩ |
| সপ্তসমুদ্র | ২২৩ |
| সপ্তস্বর | ২২৩ |
| সপ্তদ্বীপ | ২২৩ |
| স্ফোট্ | ৩০ |
| সুষুপ্তি | ২১৮ |
| সপ্তপাতাল | ২২৩ |